লক্ষ্মীর পাঁচালী

সমরেশ মজুমদার

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স
প্রা ই ভে ট লি মি টে ড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

গঙ্গার গা ঘেঁষে এই বিশাল বাড়িটি তৈরী করিয়েছিলেন রায়বাহাদুর কালীকিঙ্কর রায়। সিপাহী বিদ্রোহের সামান্য পরে যখন দেশের অস্থির রাজনৈতিক অবস্থার জটিলতায় ইংরেজ সরকার কিছুটা নাস্তানাবুদ, তখন একটি শিক্ষিত বাঙালী সম্প্রদায় তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। কৃতজ্ঞতা না হোক সৌজন্য-বশত পরবর্তী সময়ে ওই সম্প্রদায় কিছুটা সুবিধে পেতে থাকলেন সরকারের কাছ থেকে। কালীকিঙ্কর রায়ের নামের আগে রায়বাহাদুর উপাধি পাওয়ার পর যেন রাতারাতি কপাল খুলে গেল।

খুব সামান্য অবস্থা থেকে সচ্ছলতার মধ্যে সংসারকে এনে দাঁড় করিয়েছিলেন কালীকিঙ্কর কিন্তু এতে তাঁর চিত্তে সুখ ছিল না। বাংলাদেশের আর পাঁচজন রাজা সাহেব বা রায়বাহাদুরের তুলনায় তাঁকে বিত্তহীনই বলা যায় এ কথাটা শয়নে স্বপনে তাঁকে পীড়া দিত। ইংরেজ সরকারের বদান্যতায় দক্ষিণে বেশ কিছু একর জমি তাঁর ভাগ্যে জুটেছিল কিন্তু সেখানে চাষ করাই ছিল মহা সমস্যা। অনুর্বর মাটি ফসল ফলাতে ছিল বেদম নারাজ।

রায়বাহাদুর উপাধি পাওয়ার পর চুঁচড়ার গঙ্গার তীরে প্রায় সব সঞ্চয় নিঃশেষ করে একটি বিশাল বাড়ি নির্মাণ করলেন কুলগুরু বগলাচরণ ভট্টাচার্যের নির্দেশে। বস্তুত এরকম একটা অট্টালিকা তৈরী না করতে পারলে সমাজে রায়বাহাদুর হিসেবে মর্যাদা রাখা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে প্রাসাদ বানানোর ব্যাপারে তাঁর খুবই দ্বিধা ছিল। বগলা ভট্টাচার্য তাঁকে অভয় দিলেন, আস্তাবল না বানালে ঘোড়া আসবে না।

কয়েক বিঘে জমি নিয়ে গঙ্গার গা ঘেঁষে বাড়ী তৈরী হল। গেটের পরই বিরাট চৌকো বাঁধানো চাতাল। তার এ-পাশ ও-পাশে কয়েকটি উড়ন্ত পরীর মার্বেল মূর্তি ছড়ানো। চাতালের শেষেই দোতলা বাড়ির শুরু, লম্বা হয়ে অনেকটা দূর চলে গেছে। দোতলার প্রতিটি ঘরে যাতে গঙ্গার নির্মল বাতাস খেলা করতে পারে সেটা লক্ষ রাখা হয়েছিল। ভেতরেও ছোট বাঁধানো উঠোন আছে ঝি চাকরের কাজকর্মের জন্য। দোতলায় বাবু-বিবি, এক তলায় দাসদাসীদের বসবাসের ব্যবস্থা।

গৃহপ্রবেশের পর কালীকিঙ্করের স্ত্রীর ফাঁকা ফাঁকা লাগে এই বাড়ি। অর্থাভাবে দাসদাসী প্রায় নেই বললেই চলে, স্বামীকে তিনি গঞ্জনা দিতেন যে শুধু ইট সুরকি খেয়ে থাকলেই যেন পেট ভরবে।

কালীকিঙ্কর বিদ্বান ব্যক্তি, বিষয় সম্পত্তি কম বোঝেন এবং এটাও জানেন যে শুধু বিদ্যা দিয়ে তিনি বড়লোক হতে পারবেন না। পথ চলতি মানুষ এই বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় মুগ্ধ চোখে যে চেয়ে থাকে সেটাই এক সময় অসহ্য হয়ে উঠতে লাগল তাঁর।

বংশ পরম্পরায় কালীকিঙ্কর রায় শাক্ত। প্রতি বছর কালী পুজোর সময় সমারোহে উৎসব করার চেষ্টা করেন কালীকিঙ্কর। সামর্থ্য কম হলেও নিষ্ঠার অভাব হত না। নতুন গৃহ নির্মাণের পর কালীকিঙ্কর দুশ্চিন্তায় পড়লেন। এই বছর মায়ের পুজো আরো বড় ভাবে করা উচিত নইলে মান থাকে না। শেষ পর্যন্ত কালীকিঙ্কর কুলগুরু বগলাচরণের শরণাপন্ন হলেন।

বগলাচরণ ভট্টাচার্য তান্ত্রিক। কোলকাতা শহরের গণ্যমান্য মানুষ তাঁর কাছে নানান অভিলাষে আনাগোনা করেন। বাণ মারা দণ্ডীকাটা ইত্যাদি কর্মে তিনি সিদ্ধহস্ত। বিবাহাদি করেননি, দীর্ঘদেহ রক্তবস্ত্রে আবৃত রাখেন। যখন কথা বলেন তখন মনে হয় শঙ্খ বাজছে। কালীকিঙ্করকে তিনি জন্মাবধি

দেখছেন বলে কিঞ্চিৎ স্নেহ করেন। কোষ্ঠী বিচার করে কালী-কিঙ্করের বাল্যকালে তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, এই বালক অসাধারণ ভাগ্য নিয়ে জন্মেছে এবং পরবর্তীকালে রাজপুরুষের সম্মান পাবে। বস্তুত তাঁরই নির্দেশিত পথে-চলে কালীকিঙ্কর ইংরেজ সরকারেব কৃপাধন্য হয়েছিলেন। তাঁরই আদেশে এই গৃহ নির্মাণ।

অতি প্রত্যুষে কালীকিঙ্করকে দেখে অবাক হলেন বগলাচরণ। মন্দিরের সামনে একটা আসনে বসেছিলেন তিনি, শিষ্যকে কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমায় খুব চিন্তিত দেখাচ্ছে যেন, সমস্যাটা কি?'

কালীকিঙ্কর হাত জোড় করে নিবেদন করলেন, 'সবই তো আপনার গোচরে আছে গুরুদেব। কিন্তু এভাবে তো আর চলে না, আপনি একটা ব্যবস্থা করুন।'

বগলাচরণ বললেন, 'এতে তো তোমার সমস্যাটা বোধগম্য হলো না।'

কালীকিঙ্কর কুণ্ঠিত গলায় জানালেন, 'আপনার দয়ায় আমার সব কিছু হয়েছে। সরকার বাহাদুর উপাধি দিয়েছেন, সাধারণ মানুষ সম্মান করে, কিন্তু তাতে তো পেট ভরে না। যে জমি-জমা আছে তাতে অল্প শস্যই পাই। রায়বাহাদুর হবার পর পুরাতন বৃত্তিতে আর ফিরে যেতে পারছি না। যা সঞ্চয় ছিল তা উজাড় করে গৃহ প্রস্তুত করিয়েছি কিন্তু আর পাঁচজন রায়-বাহাদুরের তুলনায় আমি যে দরিদ্র এটা আর চাপা থাকছে না যে!'

বগলাচরণ 'উর্ধ্বমুখ' হয়ে খানিক চিন্তা করে বললেন, 'সরস্বতী আর লক্ষ্মীর সম্পর্ক সতীনের। দুজনে একসঙ্গে অবস্থান করেন না সচরাচর।'

কালীকিঙ্কর বললেন, 'আমার এখন যে অবস্থা তাতে সরস্বতী যদি বিদেয় হন তাতে আর আক্ষেপ করব না। আমার চেয়ে মহামূর্খ মানুষ শুধু পয়সার জোরে সমাজে দাবিয়ে বেড়াচ্ছে। পাণ্ডিত্য নিয়ে আমি কি ধুয়ে জল খাবো?'

বগলাচরণ হাসলেন, 'আজ তোমার এ কথা মনে হচ্ছে বটে কিন্তু ভুলে যাচ্ছ কেন ইংরেজ সরকার তোমাকে শিরোপা দিয়েছে ওই পাণ্ডিত্যের জন্য।'

কালীকিঙ্কর বললেন, 'আর শিবপ্রসন্ন মল্লিক? ওর তো পেটে এক চিলতে বিদ্যে নেই, শুধু অর্থের জোরে সে রায়বাহাদুর

হয়ে গেল। গুরুদেব, আর ছলনা করবেন না, আমি জানি আপনি কৃপা করলে আমার আর কোন অভাব থাকবে না।'

বগলাচরণ মাথা নাড়লেন, 'বৎস কালীচরণ, তোমার যদি কোন শত্রু থাকতো যে তোমার অনিষ্ট করতে চায় আমি তার একটা বিধান করতে পারতাম। কিন্তু—।'

কালীকিঙ্কর অসহায় গলায় বলে উঠলেন, 'আমি কিছু জানি না, আপনি আমার একমাত্র আশ্রয়।'

বগলাচরণ শিষ্যের মুখের দিকে ক্ষানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে ম্লান হাসি হাসলেন, 'জীবনে যা কখনো করিনি এখন বোধ হয় তাই করতে হবে। যে দুটো হাতে শক্তির সেবা করেছি এতদিন সেই হাতে এখন লক্ষ্মীকে আরাধনা করতে বলছ?'

'লক্ষ্মী!' কালীকিঙ্কর চমকে উঠলেন। কয়েক পুরুষ ধরে তারা শাক্ত। বস্তুত বৈষ্ণব সম্প্রদায় সম্পর্কে চিরকাল তাঁরা হেলাফেলা করে এসেছেন। নরম, তুলসীপাতা মার্কা ধর্ম কখনই পুরুষের জন্য নয় এই বিশ্বাস চিরকাল লালন করে এসেছেন। এখন গুরুদেব যা বলছেন তাতে তো ধর্মচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা। না, যতই হেনস্থা হোক সে তিনি হতে দেবেন না। তিনি এই তান্ত্রিক পবিত্র পুরুষকে কি করে বৈষ্ণব প্রথায় পুজো করতে বলবেন?

কালীকিঙ্কর গুরুদেবকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালেন, 'না

গুরুদেব, আমার অর্থের প্রয়োজন নেই।'

কপালে ভাঁজ পড়ল বগলাচরণের, শিষ্যের মুখের দিকে তাকিয়ে উচ্চারণ করলেন, 'মূর্খ'।' গলার স্বরে এমন একটা গাম্ভীর্য এবং শ্লেষ মেশানো ছিল যে কালীকিঙ্কর কেঁপে উঠলেন।

বগলাচরণ মুখ না সরিয়ে বললেন, 'অর্থের প্রয়োজন নেই এই কথাটা জীবনে উচ্চারণ করবে না। অর্থহীন গৃহী শৃগালের তুল্য নয়। বোসো।'

কালীকিঙ্কর আবিষ্টের মত আবার বসলেন। অভিজ্ঞতা থেকে তাঁর হৃদয় বলছিল এবার একটা কিছু বিহিত হবে। গুরুদেব নিশ্চয়ই কোন পথ দেখাবেন। লাঠি না ভেঙ্গেও তো সাপ মারা যায়, কালীকিঙ্করের সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ অনুভূত হল।

বগলাচরণ চক্ষু মুদ্রিত করে মনঃসংযোগ করলেন। এ সময় তাঁকে বিব্রত করা উচিত নয় জেনে কালীকিঙ্কর ইষ্ট নাম জপ করতে লাগলেন। কিছু সময় অতিবাহিত হবার পর বগলাচরণ বললেন, 'নারীর অপর নাম শক্তি। আমাদের সাধনা শক্তির সাধনা। কালী দুর্গা লক্ষ্মী সেই শক্তির বিভিন্ন রূপ। জগৎ কার বশ? না, বাহুবল আর অর্থবল। তা হলে লক্ষ্মীকে আরাধনা করা মানে শক্তিকেই আরাধনা করা। কিন্তু আমি তাঁর পূজা শাক্ত মতেই করব।'

কালীকিঙ্কর বললেন, 'শাক্ত মতে লক্ষ্মী পূজা?'

বগলাচরণ বললেন, 'হ্যাঁ। তোমার গৃহে একটি নতুন কক্ষ নির্মাণ কর। মাটি থেকে অন্তত দশ হাত নীচে সেই কক্ষে কোন জানলা থাকবে না। একটি মাত্র সুড়ঙ্গ পথে সেখানে প্রবেশ করা যাবে। আমি ওই কক্ষে লক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা করব।'

'মাটির নীচে?' কালীকিঙ্কর হতভম্ব হয়ে পড়লেন।

'হ্যাঁ, তা হলেই সে বেটি আর পালাতে পারবে না। আমি তাকে গণ্ডী দিয়ে বেঁধে রাখবো যত অনাচার হোক সে আর তোমার বাড়ি থেকে বের হতে পারবে না।'

বগলাচরণের কণ্ঠের উত্তেজনা কালীকিঙ্করকে স্পর্শ করল। তিনি হাতজোড় করলেন, 'লক্ষ্মী আর আমার বাড়ি থেকে কখনো চলে যাবেন না?'

'যাওয়ার উপায় থাকবে না। আর যতদিন সে থাকবে ততদিন তোমার কোন অমঙ্গল হবে না।'

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন বগলাচরণ। যেন সামনে কিছু দেখতে পেয়েছেন তিনি।

সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন কালীকিঙ্কর। তারপর নতমস্তকে বললেন, 'না গুরুদেব, অহঙ্কার কখনোই আমাকে আচ্ছন্ন করবে না। শুধু আমি একটু মাথা তুলে দাঁড়াতে চাই যাতে ওই বড়-লোকগুলো একটু শায়েস্তা হয়।'

কালীকিঙ্করের মুখের দিকে তাকিয়ে বগলাচরণ বললেন, 'কিন্তু

পেতে হলে কিছু দিতে হয়, তুনিয়ার এটাই নিয়ম। তুটো শর্ত আছে।'

'বলুন গুরুদেব, আপনার যে-কোন আদেশ শিরোধার্য।' করজোড়ে দাঁড়িয়ে আছেন কালীকিঙ্কর। আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর প্রাপ্তির সম্ভাবনায় তিনি অধীর হয়ে পড়েছেন।

'তুমি পারবে?' বগলাচরণ কেমন যেন সন্দিগ্ধ।

'আমি যদি আপনার উপযুক্ত শিষ্য হই তা হলে কখনো পিছুপা হবো না।'

'শোন কালী, তোমার গৃহে আমি যে লক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা করে আসব তাকে পুজো করবার যোগ্যতা তোমাদের নেই। তোমাদের বংশে যদি কোন বধূ কখনো আসে যে রজস্বলা হয়নি, এবং স্বামী সংসর্গ করেনি সেই এই দেবীকে পুজো করবে। পুজো হবে কোজাগরী পূর্ণিমার রাতে।' বগলাচরণ কথা বন্ধ করলেন।

কপালে ভাঁজ পড়ল কালীকিঙ্করের। তাঁর স্ত্রীর অনেক দিন হল ঋতুবন্ধ হয়েছে। একমাত্র পুত্রের বিবাহ হয়ে গেছে, পুত্রবধূ সন্তানসম্ভবা। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তিনি বা তাঁর পুত্র কেউই ওই দেবীর পুজো করতে পারবেন না। নাতি কৈশোরে পড়লে বিবাহ দিয়ে ঘরে বধূ আনতে হবে। না, বাল্যকালেই সেই বিবাহ হওয়া দরকার কারণ একজন কিশোরের বাসনা থেকে তার স্ত্রীকে রক্ষা করা অসম্ভব হতে পারে। কিন্তু বিদ্যাসাগর

মশাই যেভাবে বাল্যবিবাহ রদ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তাতে সে সময় এই নিয়ম যদি চালু না থাকে ? তা ছাড়া অতদিন দেবীর কোন পুজো হবে না ? নিয়মিত পুজো না হলে দেবী প্রসন্ন হবেন ? কালীকিঙ্কর নিজের আশংকা ব্যক্ত করলেন।

বগলাচরণ বললেন, 'বন্ধনে থাকাকালীন দেবীর কিছু করার উপায় থাকবে না। তবে তাঁর সব অভিমান ধুয়ে মুছে যাবে যেদিন সেই অপাপবিদ্ধা বিবাহিতা রমণী তাঁকে পুজো করবে। যতদিন সেটা সম্ভব না হচ্ছে ততদিন তোমাদের সবই হবে কিন্তু কোথাও ফাঁক থেকে যাবে। সেই পুজোর পরই তোমরা হবে কুবেরের সমকক্ষ।'

কালীকিঙ্কর হঠাৎ একটি উপায় চিন্তা করলেন। সমাজে সে সময় বহুবিবাহ প্রথা চালু আছে। এখন যদি তিনি ঋতুমতী নয় এমন কোন বালিকাকে বিবাহ করে তাকে দিয়ে দেবীর পুজো করান তা হলেই তো সমস্যা মিটে যায়।

বগলাচরণ মানুষের মন দর্পণের মত পরিষ্কার পাঠ করতে পারেন। কালীকিঙ্করের চিন্তা শেষ হওয়া মাত্রই তিনি মাথা নাড়লেন, 'না হে, তা সম্ভব নয়। সেই রমণীকে প্রথমা স্ত্রীর মর্যাদা দিতে হবে। তোমার বা তোমার পুত্রের দ্বারা সেটা সম্ভব নয়।'

বিরস মুখে বসে থাকলেন কালীকিঙ্কর। একটা দীর্ঘশ্বাস

তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ করে বেরিয়ে এল। যাক, সব মানুষের তো জীবনে সম্পূর্ণ সফলতা আসে না। তাঁর বংশে যদি কখনো কোন পুত্রবধূ এই যোগ্যতা নিয়ে দেবীর পুজো করতে পারে তবে তারাই সুখভোগ করবে। কালীকিঙ্করের মনে পড়ল বগলাচরণ তুটো শর্তের কথা উল্লেখ করেছিলেন। দ্বিতীয়টি জানা হয়নি। অবশ্য না জানলেও তিনি যে কোন আদেশ মানবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছেন।

বগলাচরণ আবার কথা শুরু করলেন, 'এবার দ্বিতীয় শর্তের কথা বলি। তোমার ললাট-রেখা বলছে তুমি দীর্ঘ জীবন পাবে না। বস্তুত মানুষের পক্ষে দীর্ঘজীবন লাভ নরক-যন্ত্রণার সামিল। কারণ মানুষের লোভের শেষ নেই, সর্বদাই সে অ-তৃপ্তিতে ভোগে। তাই তোমার গৃহে লক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠার ফলভোগ তুমি করতে পারবে না। এমন অনেক বৃক্ষ আছে যার বীজ যে বপন করে সে ফল খেতে পারে না। উত্তরাধিকারীরা সেই ফলের স্বাদ গ্রহণের সময় তাঁর নাম স্মরণ করে। তুমি কি এই ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত?'

এক মুহূর্ত চিন্তা করলেন কালীকিঙ্কর। বর্তমানে তিনি কোন উপায়েই কিছু লাভ করতে পারছেন না। এইভাবে চললে তাঁর বংশধরদের তিনি শুধুই দারিদ্র্যের মধ্যেই রেখে যাবেন এবং তাতে কোন সম্মানবৃদ্ধি হবে না। কালীকিঙ্কর নীরবে ঘাড় নাড়লেন।

কালীকিঙ্করের মুখের দিকে তাকিয়ে এইবার বগলাচরণ চূড়ান্ত শর্তটি ব্যক্ত করলেন, 'কক্ষটি হবে মাটির নীচে। ওপর থেকে দশটি প্রশস্ত সিঁড়ি নীচে নেমে একটি বড় চাতাল শেষ হবে। চাতালটির প্রান্তেই থাকবে কক্ষটি। ওই কক্ষের আর কোন গবাক্ষ থাকবে না শুধু একটি দরজা দিয়েই তাতে প্রবেশ করা যাবে। মনে হয় এর জন্যে তেমন কিছু বেশী ব্যয় হবে না। দেবীকে ওই কক্ষে আবদ্ধ করে রাখার একটি বিপদ আছে। সেই বিপদ নিরসনের জন্য একটি আত্মার প্রয়োজন। ওই আত্মা দেবীর সঙ্গে অবস্থান করবে। যখন তোমার বংশের সেই পুত্রবধূ পূজা সম্পন্ন করবে তখনই ওই আত্মা মুক্তি পাবে। যতদিন সেটা না হচ্ছে ততদিন তার ওপর এই মহান দায়িত্ব অর্পণ করা হবে।'

বগলাচরণ কথা শেষ করতে চমকে উঠলেন কালীকিঙ্কর, 'আত্মা!'

'হ্যাঁ।' দুই রক্তচক্ষু মেলে ধরে বগলাচরণ বললেন, 'তোমার অত্যন্ত প্রিয়জনের আত্মা যে তোমার বাসনাকে চরিতার্থ করতে সাহায্য করবে।'

কালীকিঙ্করের মনে হল তাঁর চারপাশে পৃথিবীটা টলছে। শাক্ত মতে দীক্ষিত হওয়ায় তিনি আত্মাবন্দী করার প্রক্রিয়া সম্পর্কে বাল্যকাল থেকে যথেষ্ট অবহিত আছেন। সামান্য একটা

বাসনার জন্য এই রকম একটি কার্য করতে তাঁর লোভ এখন ক্ষয় পেতে শুরু হল। তিনি করজোড়ে বললেন, 'গুরুদেব, আপনি ক্ষান্ত হন। আমার আর বাসনা নেই বড়লোক হবার। যেমন চলছে তেমন চলুক।'

বগলাচরণ হাসলেন, 'আমি জানতাম তুমি মুখে যতটা কঠোরতা দেখাও আসলে তার বিন্দুমাত্র নও। গায়ে কাদা লাগলে তা ধুয়ে ফেলাই প্রয়োজন নইলে চর্মরোগ হয়। যাও, তুমি এবং তোমার বংশধররা কোনদিনই আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না।'

ভারী পায়ে ফিরে এলেন কালীকিঙ্কর। তবু মনে একটু আরাম হচ্ছিল তাঁর।

কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যে ভীষণ দোটানায় পড়ে গেলেন কালীকিঙ্কর। অহর্নিশ গৃহিণীর গঞ্জনা, পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায় সঙ্কুচিত হয়ে থাকা এক সময় অসহ্য হয়ে উঠল। ক্রমাগত দ্বন্দ্বের মধ্যে থেকে কালীকিঙ্কর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বুকে যন্ত্রণা হয়,

গলায় ব্যথা। বিখ্যাত কবিরাজ জ্ঞানপ্রকাশ মুখোপাধ্যায় রোগ নির্ণয় করতে পারলেন না।

খবর পেয়ে গুরুদেব বগলাচরণ এলেন। কিছুক্ষণ মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বৎস কালীকিঙ্কর, আমার যদ্দুর অনুমান তুমি কর্কট রোগে আক্রান্ত হয়েছ। এই রোগ থেকে মুক্তির আশা করা বৃথা। এখন যদ্দিন জীবিত থাকবে তদ্দিন মায়ের নাম উচ্চারণ কর। পৃথিবীটা আমাদের প্রবাস, তুমি স্বদেশে ফেরার সময় ধীর চিত্তে ফিরে যাও।'

কালীকিঙ্কর এরকম একটা অনুমান করেছিলেন। খুব সচেতন মানুষ নিজের ভবিতব্য অনুধাবন করতে পারে। মুহূর্তেই মন স্থির করে নিলেন তিনি। যে দ্বিধা কখনো কখনো দীর্ঘ দিনেও সমাধান খুঁজে পায় না এক মুহূর্তেই সেটা ঝেড়ে ফেলে দেওয়া সম্ভব হতে পারে। গুরুদেবের মুখের দিকে তাকিয়ে কালীকিঙ্কর বললেন, 'আশীর্বাদ করুন যেন আপনার উপদেশ মত চলতে পারি। কিন্তু একটা অনুরোধ, আমার গৃহে দেবীর প্রতিষ্ঠার কাজ এবার আপনি শুরু করুন।'

বিস্মিত বগলাচরণ বললেন, 'তুমি—তুমি মন স্থির করেছ?'

কালীকিঙ্কর মাথা নাড়লেন, 'হ্যাঁ।'

বগলাচরণ বললেন, 'কালীকিঙ্কর, তোমার মনে কোন দ্বিধা নেই?'

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু না হলে গুরুদেব তাঁকে প্রকৃত নামে সম্বোধন করেন না। কালীকিঙ্কর বললেন, 'না, আমি এখন প্রস্তুত।'

স্ত্রীকে জানালেন কালীকিঙ্কর। গুরুদেবের বিধানমত মন্দির প্রস্তুত করতে হবে। কিন্তু প্রথম শর্তটির কথা বললেও দ্বিতীয়টি না বলাই শ্রেয় মনে হল তাঁর। স্ত্রীলোকের মন ঈশ্বরেরও অজানা থাকে। কথাটা পাঁচ কান হওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। প্রকল্পটি শুনে স্ত্রীকে খুব উৎসাহিত দেখাল। ভেতর বাড়ির চাতালের এক পাশে মাটি খুঁড়ে সেখানেই মন্দির করলে শোভন হবে। কিন্তু এই কাজে অর্থ নেহাৎ কম প্রয়োজন হবে না। কালীকিঙ্করের স্ত্রী নির্দ্বিধায় তাঁর প্রিয় অলঙ্কারগুলি দান করলেন। আজ তিনি যা দিচ্ছেন আগামীকাল তা যদি বহু গুণ হয়ে ফিরে আসে তা হলে দিতে আপত্তি কি।

খুব দ্রুত কাজ শেষ হল। সিঁড়ি দিয়ে চাতাল পর্যন্ত সহজেই পৌঁছানো যায়। কিন্তু প্রশস্ত কক্ষটিতে প্রবেশ করলে অস্বস্তি হয়। সেখানে আলো না ঢোকায় একটা মায়াময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। সামান্য কথা বললে তা চতুর্গুণ হয়ে ফিরে আসে, গমগম করে। বগলাচরণ নির্দেশ দিয়েছেন দেবীর কোন মূর্তি যেন নির্মাণ করা না হয়। শক্তির আসল রূপ তার প্রয়োগে। মিথ্যে আকারের দরকার নেই এ ক্ষেত্রে। আম্রপত্র

তাম্রঘট এবং কচি ডাবেই দেবীর প্রতিষ্ঠা হবে

কোজাগরী পূর্ণিমার বেশী দেরী ছিল না। কালীকিঙ্কর ক্রমশ আরো অসুস্থ হয়ে পড়ছিলেন। মৃত্যু বড় কাছে এই সত্য যত স্পষ্ট হচ্ছে তত তাঁর আচার ব্যবহার শান্ত হয়ে যাচ্ছে। তিনি বগলাচরণকে অনুরোধ করেছিলেন তাঁর এই রোগের কথা যেন আর কাউকে জানানো না হয়। স্ত্রীর কাছেও তিনি ব্যক্ত করেননি কিছু। এতদিন ধরে তাঁর সমস্ত সত্তা মুখিয়ে ছিল কোজাগরী পূর্ণিমার রাতের জন্য। শেষ পর্যন্ত সেই রাতটি এল। এই রাতে বগলাচরণ কালীকিঙ্করের নবনির্মিত ভূগর্ভস্থিত কক্ষে দেবীর প্রতিষ্ঠা করবেন।

সকাল থেকেই বাড়িতে উৎসবের আবহাওয়া। চুচুঁড়া শহরের মানুষ একটু অবাক হয়েছিল। কালীকিঙ্করেরা ঘোর শাক্ত, তাঁদের বাড়িতে এমন ঘটা করে লক্ষ্মী পুজো হচ্ছে এটা একটা সংবাদ। কালীকিঙ্করের স্ত্রী সব রকম আয়োজন করছেন। তাঁর শেষ অলঙ্কার ব্যয় হয়ে গেল এই বাবদে।

সন্ধ্যো বেলায় বগলাচরণ এলেন। রক্তবস্ত্র, কপালে বিরাট

সিঁদূর টিপ, পায়ে খড়ম—এই মানুষটি আসামাত্রই পরিবেশ গুরুগম্ভীর চেহারা নিয়ে নিল। পুজো শুরু হল। বাইরে কাঁসর ঘণ্টা বাজছে। কক্ষের ভেতর রেড়ির তেলের বিরাট প্রদীপ জ্বলছে। বগলাচরণ মন্ত্র উচ্চারণ করছেন, সমস্ত ঘরে তার প্রতিধ্বনি কাঁপছে।

কালীকিঙ্করকে সযত্নে ওই কক্ষে নিয়ে আসা হয়েছে। এখন হাঁটতে গেলে শরীর থর থর করে কাঁপে। এই দুজন ছাড়া ওই কক্ষে আর কেউ নেই। কক্ষের দরজা বন্ধ। কালীকিঙ্করের শিহরণ হচ্ছিল। আজ রাতে পুজোর শেষে দেবী এই গৃহে বন্দী হয়ে থাকবেন। তাঁর বংশধররা অর্থে সামর্থ্যে পাঁচজনের মাথা ছাড়িয়ে যাবে। রাবণ তার রাজ্যে সমস্ত দেবতাদের আবদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছিল বলেই স্বর্ণলঙ্কার অধিপতি হতে পেরেছিল। শুধু অহঙ্কারই তার বিনাশের কারণ হল। কালীকিঙ্কর তাঁর পুত্রকে বলেছেন কখনই যেন তারা অহঙ্কারী না হয়।

পুজোর মধ্যপর্বে বগলাচরণ শিষ্যের দিকে তাকালেন। কালীকিঙ্কর যুক্তকরে বসে আছেন। বগলাচরণ বললেন, ‘দ্বিতীয় শর্তটির কথা স্মরণে আছে কালীকিঙ্কর?’

মাথা নাড়লেন কালীকিঙ্কর, ‘হ্যাঁ, গুরুদেব।’

বগলাচরণ বললেন, ‘তোমার প্রিয়জনকে তুমি নির্বাচিত করেছ?’

মাথা নাড়লেন কালীকিঙ্কর, 'হ্যাঁ।'

'তুমি নিশ্চয়ই জানো যে আত্মাকে বন্ধন করা মানে তার শরীর নিপাত হওয়া?' বগলাচরণ চূড়ান্ত সত্য জানালেন।

'জানি গুরুদেব।' কালীকিঙ্করের কণ্ঠ একটুও কাঁপল না।

'বেশ। আত্মা বন্ধনের প্রথম প্রক্রিয়াটা নিশ্চয়ই তোমার জানা আছে তবু আমি তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিই।' হাত বাড়িয়ে সামনে রাখা একটি কচি ডাব তুলে নিয়ে ধারালো ছুরির এক আঘাতে সেটির ওপরের অংশটিকে কেটে ফেললেন বগলাচরণ। ডাবের জলটুকু সম্পূর্ণ ফেলে দিয়ে এবার দুটো বিচ্ছিন্ন অংশ জোড়া দিয়ে শিষ্যের হাতে দিলেন কয়েকটি মন্ত্র উচ্চারণ করে. 'কালীকিঙ্কর শক্ত হাতে ওই ডাবের মুখটি বন্ধ করে রাখো ওপরের অংশ দিয়ে। তোমার যে প্রিয়জন তার কাছে গিয়ে খুব ধীরে তার নাম ধরে ডাকবে। ডাকটি যেন স্নেহমিশ্রিত হয়। যেই সে উত্তর দেবে সঙ্গে সঙ্গে এই ডাবের মুখটি খুলে ওই ধ্বনিটি এতে গ্রহণ করে পুনর্বার দ্রুত হাতে আবার বন্ধ করে ফেলবে। কাজ হয়ে গেলে ওই বন্ধ ডাবটি আমার কাছে ফিরিয়ে আনো।'

কালীকিঙ্কর গুরুদেবের মুখের দিকে ওই স্বল্পালোকে একবার তাকিয়ে চোখ বন্ধ করলেন। অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি অশ্রু বন্ধ করতে পারলেন না। তাঁর গালের ওপর জলের ধারা

গড়িয়ে এল। বগলাচরণ বললেন, 'তোমার কি কোন অসুবিধে হচ্ছে কালীকিঙ্কর? আমি কি আবার বুঝিয়ে দেব?'

কালীকিঙ্কর মাথা নাড়লেন, 'না।'

বগলাচরণ এবার শিষ্যের মুখে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে দেখলেন, 'মন স্থির কর কালীকিঙ্কর। যে পূজা আমি আজ আরম্ভ করেছি তা অসমাপ্ত থাকলে ঘোর অমঙ্গল হবে। এখন কোন অবস্থায় পেছন ফেরা যাবে না।'

চোখের জল মোছার কোন রকম চেষ্টা করলেন না কালীকিঙ্কর। দু হাতে ধরা ডাবটির দিকে অপলকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'না গুরুদেব, আমি পেছন ফিরব না। আপনি আশীর্বাদ করুন যেন আমার বংশধররা সুখে থাকে। আমি আমার সবচেয়ে প্রিয় আত্মা এই ডাবের ভেতর রেখে দিচ্ছি।'

ইষ্টনাম জপ করে কালীকিঙ্কর হঠাৎ জোরে অথচ স্নেহমিশ্রিত কণ্ঠে ডেকে উঠলেন, 'কালীকিঙ্কর!' ডাক শেষ হতেই দ্রুত হাতে ডাবের বিচ্ছিন্ন মুখটি সরিয়ে ফেলে উত্তর দিলেন, 'বলুন।' প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যাওয়ার আগেই দ্রুত হাতে বিচ্ছিন্ন মুখটি ডাবের ওপর চেপে ধরে গুরুদেবের দিকে এগিয়ে ধরলেন তিনি, 'নিন গুরুদেব। আমার চেয়ে প্রিয় আত্মা আর আমার কে হতে পারে?'

প্রদীপের আলো সারা ঘর জুড়ে কাঁপছিল সে সময়।

তান্ত্রিক বগলাচরণ কালীকিঙ্কর রায়ের বাড়ীতে লক্ষ্মীকে বন্দী করেছেন এই সংবাদ চতুর্দিকে রাষ্ট্র হতে বিলম্ব হল না। ধনীরা ঈর্ষা প্রকাশ করলেন, সাধারণ মানুষ চমকিত এবং কিছুটা শ্রদ্ধাবনত। কালীকিঙ্কর এখন শয্যাশায়ী। মৃত্যু যে দরজায় তা আর কারো বুঝতে বাকি নেই।

গুরুদেব বগলাচরণ সেই রাতের পর আর এই বাড়িতে আসেননি। শেষ রাতে পুজো শেষ করে তিনি শিষ্যের হাত ধরে বাইরের চাতালে এসে দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন নিজে। বিশাল তালা ঝুলিয়ে দিয়ে তার চাবি কালীকিঙ্করের হাতে দিয়ে বলেছিলেন, 'এই চাবি তোমার পুত্রের হাতে দিয়ে যাবে। সে গত হওয়ার সময় তার প্রথম পুত্রকে দেবে। কোন অবস্থায় তারা যেন চাবি সঙ্গছাড়া না করে। এই কক্ষের দ্বার কখনই খোলা হবে না। তোমার বংশের পুত্রবধূ যখন পূজার উপযুক্ত হবে তখন এই দরজায় ঘট স্থাপন করে এই চাতালেই পূজা করবে সে। ঘরের দরজা খোলা মানে সর্বনাশ ডেকে আনা। সবাইকে বলে দিও।'

কথাগুলো সবাই শুনেছে, মুখে মুখে আরো ডালপালা মেলে তার শ্রীবৃদ্ধি হতে আরম্ভ করল। অথচ এই সংসারের ওপর কোন প্রতিক্রিয়া নেই। যেমন খুঁড়িয়ে চলছিল তেমনই চলছে। কালীকিঙ্করের স্ত্রী ক্রমশ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছিলেন। দেবী এই

গৃহে বন্দী থাকলে তাদের ধনরত্ন উপচে পড়ার কথা তার বদলে তিনি বৈধব্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। তাহলে এত আয়োজন, এত খরচের কি প্রয়োজন ছিল। কালীকিঙ্করের কিন্তু স্থির বিশ্বাস একটা কিছু হবেই। এখন তিনি কথা বলতে পারেন না। গলার যন্ত্রণা তীব্র, শুধু গোঙানির মত একটা আওয়াজ হয়। সবই বোঝেন, চিন্তা করতে পারেন কিন্তু ব্যক্ত করতে পারেন না। এ এক অসহ্য যন্ত্রণা।

কার্তিকের শেষে হঠাৎ দেশজুড়ে অকালবর্ষণ শুরু হল। বর্ষাকালেও এই রকম জল আকাশ থেকে ঝরে না। শস্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে দেখে চাষীরা মাথায় হাত দিল। নদীগুলো ফেঁপে উঠেছে হঠাৎ। বন্যা শুরু হল। সমস্ত দেশ জুড়ে হাহাকার পড়ে গেল।

দক্ষিণ থেকে খবর এল, কালীকিঙ্করের বিস্তীর্ণ ডাঙ্গা জমি এখন জলের তলায়। যে নদী নিরীহ চেহারা নিয়ে এতকাল দূরে পড়েছিল সে এখন ভীষণ হয়ে কাছাকাছি এসে

পড়েছে। তারই বানের জল কালীকিঙ্করের জমি দখল করে ফেলেছে।

দুঃসংবাদটা কালীকিঙ্করকে দেওয়া হলে তিনি চক্ষু বন্ধ করলেন। প্রথমে তাঁর মনে হল, সব কিছু বুজরুকি। দেবীকে বন্দী করে তাঁর লাভের বদলে দিন দিন ক্ষতির মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। বৎসর শেষে যে সামান্য শস্য ওই জমি থেকে আসত এবার তাও বন্ধ হল। এ কথা ঠিক, ওই জমিতে চাষ করা মুশকিল, অনুর্বর হওয়া সত্ত্বেও বছরের গ্রাসাচ্ছাদন কোনরকমে চলত। এখন কি হবে? চক্ষু বন্ধ হওয়া অবস্থাতেই আর একটি চিন্তা তাঁর মস্তিষ্কে ঝিলিক দিয়ে উঠল। এই যে হঠাৎ-আসা-বন্যা—তা দেবীর ইচ্ছেতে হয়নি কি? বন্যা যখন এসেছে তখন জল নেমে গেলে নিশ্চয়ই পলিমাটি ফেলে যাবে তার অনুর্বর ডাঙ্গায়। নদী যদি গতিপথ পরিবর্তন করে ওই জমির কাছাকাছি এসে থাকে তবে তো চাষের জলের অভাব মিটে যাবেই। হয়তো ওই বন্যার ফলে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পাবে। যে জমি বছরে একবার শস্য দিতে নারাজ ছিল সেই হয়তো তিন ফসলী হয়ে উঠবে।···ঋতুমতী না হলে নারী কি সন্তানের জননী হতে পারে? বিছানায় শুয়ে দুটো হাত কপালে ঠেকিয়ে তিনি চিৎকার করে উঠলেন মা মা বলে। গলা থেকে স্বর বের হল না, গোঙানি শুনে স্ত্রী-পুত্র ছুটে এল কাছে। তারা দেখল

আনন্দিত উল্লসিত কালীকিঙ্করের শরীর কাঁপছে। পরম তৃপ্তিতে সেই শরীর একসময় শান্ত হল, শান্ত হয়ে স্থির হয়ে গেল চিরকালের জন্য।

কালীকিঙ্কর রায়ের দ্বিতীয় পুরুষের আমলে রায়বাড়ির নামডাক চুঁচুড়া শহর ছাড়িয়ে কলকাতা অবধি পৌঁছে গেছে। কলকাতার ব্যবসায়ী মহলও জানে যে, রায়বাড়িতে লক্ষ্মী বাঁধা হয়ে আছে। যা ওরা স্পর্শ করে তাই সোনা হয়ে যায়। নইলে যে মরা নদী দু ক্রোশ দূরে মজেছিল সেই নদী এখন গহীন হয়ে রায়েদের জমির পাশে পোষা চাকরের মতো বয়ে যায়? যে জমিতে ফসল হত কি হত না সেই জমি অমন শস্যে উপচে পড়ে? কোম্পানী থেকে পাওয়া কিছু কাগজ যার মূল্য একদিন অতি সামান্য ছিল কালীকিঙ্করের দ্বিতীয় পুরুষের আমলে তাই মহামূল্যবান হয়ে গেল। তিনি সেটি ভাঙিয়ে এক হঠাৎ-খেয়ালে পশ্চিমে কিছু জমি ক্রয় করেছিলেন। কিছু দিন পর জানা গেল, ওই অঞ্চলে মাটির তলায় প্রচুর কয়লা আছে এবং সেটা রায়দের জমিতেই পড়ছে।

চিরকালই এ বাড়ির মানুষ ব্যবসা বোঝে না তাই কালীকিঙ্করের দ্বিতীয় পুরুষ এক মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীর সঙ্গে কমিশনের চুক্তিতে ওই জমিতে কয়লাখনি করার প্রস্তাবে অনুমতি দিলেন। এ থেকেই প্রতি বছর লক্ষ টাকার ওপর

আয় হবে। ঘটনাগুলো এত দ্রুত ঘটে যেতে লাগল যে, চট করে মনে হবে রায়বাড়িতে চন্দ্রসূর্য আটক হয়ে আছেন। দাসদাসী, গাড়ি ঘোড়াতে গমগম করছে চারধার। দিনরাত লোকজনের আনাগোনা। চুঁচুড়া শহরের মানুষ জেনে গেছে, কেউ কোন প্রত্যাশা নিয়ে রায় বাড়িতে গেলে বিফল হয়ে ফিরে আসবে না। দানধ্যানে এদের কুণ্ঠা নেই। যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে—এটাই যেন ভীষণভাবে বিশ্বাস করে রায়েরা আর হাতে হাতে তার ফল পাওয়া যায়।

ইংরেজ সরকারের সঙ্গে রায়েদের সম্পর্ক চিরকালই মধুর। কলকাতা থেকে যখনই কোন সাহেব চুঁচুড়ায় আসেন তখনই তিনি রায়বাড়িতে এক কাপ চা খেয়ে যান।

কিন্তু রায়েদের মন একটি ব্যাপারে প্রায়ই খুঁত খুঁত করে। তাদের যত্র আয় তত্র ব্যয়। কুবেরের সমকক্ষ হবার যে আশ্বাস তাদের পূর্বপুরুষকে একদা তান্ত্রিক বগলাচরণ দিয়ে গিয়েছিলেন তার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। কারণ কালীকিঙ্করের দ্বিতীয় পুরুষেও সেই রকম কোন পুত্রবধূর আগমন ঘটেনি।

কালীকিঙ্করের তৃতীয় পুরুষ সচ্ছলতার চূড়োয় এসে উঠল। রায়বাড়ির এখন তিন কর্তা। বড় কর্তা রামকিঙ্কর, মেজ কর্তা শিবশঙ্কর আর ছোট কর্তা হরকিঙ্কর।

বড় কর্তা বিবাহিত, কোন সন্তানাদি নেই। অত্যন্ত মেজাজী অথচ দিলদরিয়া মানুষ। দুপুর একটার কিছু পরে বড় কর্তার সকাল হয়। সেই সময় তাঁর দুজন অনুগত চাকর বিছানায় শোয়া অবস্থায় তাঁকে গা হাত পা টিপে দেয়। সেবা নেবার পর মুখ ধুয়ে রূপোর মিনে করা কাপে এক কাপ চা খান বড় কর্তা। এর পর গানবাজনার আসর বসে, প্রিয় তবলিয়া সিরাজ তৈরি হয়ে থাকে আগেই। দরাজ গলা বড় কর্তার, রায়বাড়ির সর্বত্র সেই কণ্ঠ সুরের দোলায় দুলে বেড়ায়। ছেলেবেলা থেকেই বিভিন্ন ওস্তাদের কাছে তালিম নিয়ে রামকিঙ্কর এখন ছয়টি রাগ ছত্রিশ রাগিণীকে পোষা পাখির মত উড়িয়ে দিয়ে ফিরিয়ে আনতে পারেন। অপরাহ্নে খাওয়াদাওয়ার পর রামকিঙ্কর বাইরের ঘরে এসে বসেন কিছুটা সময়ের জন্যে। এই একমাত্র সময় যখন বাড়ির সরকার মশাই বড় কর্তার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারেন। প্রার্থীরা একে একে নিবেদন জানায় আর বড় কর্তা উদার হাতে তা মঞ্জুর করেন।

সন্ধ্যের অন্ধকার গঙ্গার উপর নেমে এলেই রামকিঙ্কর অস্থির হয়ে পড়েন। দ্রুত নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে আতরজলে স্নান

সেরে প্রিয় চাকরদের হাতে নিজেকে ছেড়ে দেন। তারা বড় কর্তাকে একাধিক এক এক সাজে সাজিয়ে দেয়। ফরাসডাঙ্গার চওড়া পাড় চুনোট করা ধুতি, সিল্কের কাজকরা পাঞ্জাবি বড় কর্তার বেশী পছন্দ। সঙ্গে লম্বা সাপের আকৃতি একটি লাঠি না রাখলে কেমন শূন্য মনে হয়। লাঠিটি ফাঁপা কারণ, তার ভেতরে দীর্ঘ ইস্পাতের ধারালো ফলা লুকোন থাকে। সাজসজ্জা শেষ হলে রামকিঙ্কর ধীরেসুস্থে একবার স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। তাঁর এই আসার সময়টা এমন নির্দিষ্ট যে, তারাসুন্দরী সে সময় প্রস্তুত হয়ে থাকেন। স্বামীর সঙ্গে বাক্যালাপের সুযোগ চব্বিশ ঘণ্টায় মাত্র এই একবার। কিন্তু এই জন্য তারাসুন্দরীর কোন আক্ষেপ নেই। এই বিরাট সংসারের সমস্ত দায়িত্ব তাঁর ওপর। সে সব সামলাতেই তাঁর দিনরাত কেটে যায়। তা ছাড়া বিবাহের পনেরো বছর অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি পুত্রহীনা। বংশ যাতে লোপ না পায় সেজন্য তিনি নিজে স্বামীকে অনেক অনুরোধ করেছেন পুনর্বার বিবাহের জন্য। কিন্তু রামকিঙ্কর আর রাজি হননি। মুখে কিছু না বললেও তারাসুন্দরী তাই স্বামীর কাছে কৃতজ্ঞ।

রামকিঙ্করের পিতা পুত্রের বিবাহের সময় অনেক খোঁজ খবর নিয়ে তারাসুন্দরীকে নির্বাচিত করেছিলেন। দশমবর্ষীয়া এই কন্যা অতীব সুন্দরী, গায়ের রং সচরাচর বাঙালীদের মধ্যে দেখা

যায় না। তারাসুন্দরীর পিতার কাছে জেনেছিলেন যে কন্যা তখনও ঋতুদর্শন করেনি। খুব আগ্রহের সঙ্গে বিবাহ সম্পন্ন হল। রামকিঙ্করের তখন উনিশ বছর বয়স, খেয়ালী যুবক সারা দিনরাত গানবাজনা নিয়ে থাকেন। শ্রাবণের শেষে লগ্ন ছিল, রামকিঙ্করের পিতা কোজাগরী পূর্ণিমা পর্যন্ত পুত্রবধূকে অপাপবিদ্ধা রাখার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের কি খেয়াল, কালরাত্রির সন্ধ্যায় তারাসুন্দরী রজস্বলা হলেন। খবর পেয়ে জাহতের মত বসে থাকলেন রামকিঙ্করের পিতা।

মাত্র তিন বছর আগে তৃতীয় সন্তান প্রসবকালে তাঁর স্ত্রী গত হয়েছেন। দ্বিতীয় পুত্র শিবশঙ্কর অত্যন্ত সুবোধ বালক, পড়াশুনায় উত্তম। সেই রাত্রেই তিনি দ্বিতীয় পুত্রের বিবাহের কথা ভাবতে লাগলেন। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাসে কয়েক দিন বাদে গঙ্গা পার হবার সময় ঝড়ে নৌকা ডুবিতে রামকিঙ্করের পিতা প্রাণ হারালেন। কনিষ্ঠ হরকিঙ্করের বয়স তখন তিন।

রায়বাড়ির বিষয়সম্পত্তির ভার যেমন সরকারমশাই-এর ওপরে ভেতর বাড়ি তেমনি তারাসুন্দরীর করায়ত্ত। এখন তাঁর শরীর সামান্য স্থূল হওয়া সত্ত্বেও রূপের খামতি নেই। রামকিঙ্কর দরজায় এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'শরীর কেমন তারা?'

তারাসুন্দরী ঘাড় নেড়ে বললেন, ভালই। আসুন।'

রামকিঙ্কর ঘরে ঢুকে একবার চারদিকে নজর বুলিয়ে পালঙ্কে বসলেন, 'তারপর, তোমার সংসার কেমন চলছে ?'

তারাসুন্দরী বললেন, 'আমার সংসার বলছেন কেন ? সবই তো আপনার, আমি শুধু দেখাশুনা করি। মা যদ্দিন আমাদের বাড়িতে আছেন তদ্দিন কোন ভয় নেই।'

রামকিঙ্কর বললেন, 'মা ! হ্যাঁ, এবার মায়ের পুজোর আয়োজন করা দরকার। সরকার মশাই বললেন, এবার নাকি ফসল ভাল হয়নি।'

তারাসুন্দরী হাসলেন, 'কিন্তু মেজবাবুর মতিগতি বোঝা যাচ্ছে না। বিয়ের কথা বললেই তেড়ে আসে। বলে সংসার ওর জন্যে নয়।'

রামকিঙ্কর বিরক্ত হলেন, 'তা হলে সন্ন্যাসী হয়ে থাক, এখানে আসার কি দরকার ! এ বাড়ি থেকে টাকা নেবে অথচ বাড়ির প্রয়োজনে লাগবে না তা চলবে না। ওকে এ কথা তুমি স্পষ্ট করে বলে দেবে। নইলে আমি ছোটর বিয়ে দেবো।'

চমকে উঠলেন তারাসুন্দরী, 'ছোট ? ওর বিয়ে দেবেন ?'

'প্রয়োজন হলে তাই দিতে হবে।' রামকিঙ্কর উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর সময় হয়ে যাচ্ছে। এক হাত বাড়িয়ে তিনি বললেন, 'দাও।'

বালিশের তলা থেকে নোটের তাড়া বের করে তারাসুন্দরী স্বামীর হাতে দিতেই তিনি সেগুলো পকেটে রাখলেন। তারপর

দরজা অবধি হেঁটে গিয়ে হঠাৎ পিছু ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আজ আমার গান শুনেছ?'

তারাসুন্দরী হেসে বললেন, 'খুব ভাল লেগেছে।'

'কি গাইছিলাম বল তো?'

'পিলু বলে মনে হল। আপনিই শিখিয়েছিলেন একদিন।'

'বাঃ, এই জন্যে তোমাকে এত ভাল লাগে।' খুশীতে ঝলমল করল রামকিঙ্করের মুখ। তারপর গুণ গুণ করে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে বেরিয়ে এলেন বাইরে। নীচে সদরে তাঁর জন্যে জুড়িগাড়ি দাঁড়িয়ে গেছে ততক্ষণে। চুঁচুড়া শহর থেকে কলকাতার সোনাগাছি যেতে ঘোড়াগুলোর আর তর সইছিল না।

মেজ কর্তা শিবশঙ্কর এ বাড়ির গোত্রছাড়া। কলকাতা শহরে পড়াশুনা করতে গিয়ে তিনি স্বদেশী দলে নাম লেখান। ভারতবর্ষকে ইংরেজের শাসন থেকে মুক্ত করার সাধনা এখন তাঁর সাধনা। এ ব্যাপারে তিনি কোন আপোস করতে নারাজ। কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনে তাঁর কোন আস্থা নেই। ক্ষমতা

কখনো ভিক্ষে করে পাওয়া যায় না। সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমেই ইংরেজকে এ দেশ থেকে সরানো সম্ভব। সারা দেশব্যাপী বিপ্লব যতদিন না হচ্ছে ততদিন বিক্ষিপ্ত ভাবে ইংরেজ-হত্যাই জনসাধারণের মানসিকতাকে আন্দোলনমুখী করে তুলতে সাহায্য করবে। কিন্তু সশস্ত্র ইংরেজ সৈন্যের সঙ্গে সমানভাবে লড়াই করতে গেলে উপযুক্ত অস্ত্র দরকার। সেই অস্ত্র সংগ্রহ অর্থ ছাড়া অসম্ভব। শিবশঙ্কর অর্থবান পরিবারের মানুষ। তার ওপর তাঁদের বাড়ীতে লক্ষ্মী বাঁধা হয়ে আছেন অতএব চিন্তার কোন কারণ নেই। শিবশঙ্কর তাই মাঝে মাঝে চুঁচুড়ার বাড়িতে উপস্থিত হন। তারাসুন্দরীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ভাল। বয়সে দুজনেই প্রায় সমান। শিবশঙ্কর রাতের অন্ধকারে আসেন, তারাসুন্দরী হাতের কাছে যা আছে তাই দেওরকে দিয়ে দেন। ভোরের আলো ফুটবার আগেই চুঁচুড়া শহর ছেড়ে যান শিবশঙ্কর।

ভাই-এর গতিবিধির খবর রামকিঙ্কর রাখার সময় না পেলেও তারাসুন্দরীর কাছে কিছুই অজানা নেই। রাত্তির বেলায় যখনই শিবশঙ্কর আসেন তারাসুন্দরী দেশের খবরা-খবর তাঁর কাছে পান। মাঝে মাঝে, যেদিন হাতে বেশী টাকা মজুদ থাকে না, সেদিন অসহায় হয়ে পড়েন তারাসুন্দরী। অল্প টাকায় কিছুতেই সন্তুষ্ট নন শিবশঙ্কর। যার বাড়িতে লক্ষ্মী বাঁধা তার টাকার অভাব হবে কেন?

ছেলেমানুষের মত চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দেন তিনি অনেক কষ্টেও যখন দেওরকে বোঝাতে পারেন না তারাসুন্দরী তখন শুধু অভিমান করা ছাড়া তাঁর কিছুই করার থাকে না শিবশঙ্কর নিশ্চয়ই তাঁর বিপ্লবী বন্ধুদের কাছে তাঁদের সীমাহীন বিত্তের আস্ফালন করে আসেন তাই অল্প টাকা নিয়ে ফিরে যেতে তাঁর এই রকম আপত্তি। কিন্তু তারাসুন্দরী জানেন অর্থ যত পর্যাপ্ত এই সংসারে আসুক তারও একটা সীমা আছে। এইভাবে চোখ বন্ধ করে খরচ করলে এক সময় জল তলানিতে গিয়ে ঠেকবে।

সরকার মশাই ভাল মানুষ, দীর্ঘকাল, এ বাড়ির মঙ্গলের জন্য নীরবে কাজ করে যাচ্ছেন। যখনই যা উপায় হয় তিনি তারাসুন্দরীর হাতে সমর্পণ করেন। তাঁর একটা বাক্য খুব ভাল লাগে তারাসুন্দরীর, 'মা, লক্ষ্মী বড় চঞ্চলা—যতই বন্ধনে থাকুন তিনি, কখনো হেলাফেলা করো না।' কিন্তু খরচের যে রকম বহর বাড়ছে তাতে সঙ্গতি রাখা এর পর মুশকিল হয়ে উঠবে। ইদানীং সরকার মশাই-এর মুখ খুব গম্ভীর হয়ে থাকে। বাইরের সমস্যা সচরাচর বলতে চান না তিনি নিজেই সমাধান করে নেন।

খুব শিগগীর দেবীর পুজো করা দরকার। এ বংশে এসে তারাসুন্দরী নিজেই একটা অপরাধবোধে কুণ্ঠিত হয়ে আছেন। যে প্রবল বাসনা নিয়ে শ্বশুরমশাই তাঁকে এনেছিলেন প্রকৃতি তা হতে

দিল না। কিন্তু যদি আর দেরী হয়ে যায় তবে বড় রকম বিপদ ঘটতে পারে। স্বামীর কাছে শুনেছিলেন ওই পুজো হলে নাকি তারা কুবেরের সমকক্ষ হয়ে যাবেন। কিন্তু ছোটকর্তাকে দিয়ে বিবাহ করানো চিন্তাও করা যায় না। জেদের বসে বড়কর্তা বলতে পারেন কিন্তু বাস্তবে তা কি সম্ভব। বরং মেজকর্তাকে যদি কোন রকমে রাজী করানো যায়। তাঁর তো সংসারে কোন টান নেই, একটি বালিকাকে শুধুমাত্র পত্নীর মর্যাদা দিয়ে না হয় তিনি নিজের কাজে চলে যান। তারাসুন্দরী মনে মনে মেজকর্তাকে সম্মত করার নানা ফন্দি ফিকির করতে লাগলেন। মুশকিল হল কবে যে মেজকর্তা উদয় হবেন তা আগে থেকেই জানা অসম্ভব।

এবার এলে মরীয়া হয়ে উঠবেন তারাসুন্দরী।

ছোটকর্তা হরকিঙ্কর এই বাড়ির উত্তর দিকের শেষ ঘরটিতে থাকেন। যদিও তারাসুন্দরী দু বেলা তাঁর দেখাশোনা করেন তবু একটি সর্বক্ষণের চাকর তার জন্যে নিয়োগ করা আছে। সেই ব্যক্তি অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ, হরকিঙ্করকে পুত্রবৎ জ্ঞান করে। তাকে স্নান করায় খাওয়ায় এবং এই বয়সেও কাঁধে করে নিয়ে বাড়ির

ছাদে ঘুরে বেড়ায়। হরকিঙ্করের বয়স এখন সতের। গায়ের রঙ কাঁচা সোনার মত। রায়বংশে এই রঙ আর কেউ পায়নি। কাঁধ থেকে কোমর পর্যন্ত বলিষ্ঠ যুবাশরীর কিন্তু নিম্নভাগ সেই পাঁচ বছর বয়স থেকে বিকৃত হয়ে আছে। হাঁটাচলা দূরে থাক বসিয়ে না দিলে সহজভাবে বসা তার পক্ষে অসম্ভব। ছেলেবেলা থেকে অনেক চেষ্টার পর হরকিঙ্কর এখন লেংচে লেংচে শরীরটাকে হিঁচড়ে টেনে কিছু দূর যেতে পারে। চোখ দেখলে বোঝা যায় সে সব কিছু বোঝে, কিন্তু কথা বলতে গেলেই শরীরে কম্পন শুরু হয়। তখন এক ধরনের গোঙানি আর লালা ছাড়া মুখ থেকে কিছু বের হয় না। এতদিন শিশুর মত তাকে গল্প বলে ঘুম পাড়ানো যেত, বোঝানো যেত। ইদানীং যৌবন উদ্‌গমের পর তার স্বভাব চরিত্রের দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। হরকিঙ্কর খুব তিক্ত মেজাজের মানুষ হয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে সে তারাসুন্দরীর দিকে এমনভাবে তাকিয়ে নিজের দুই বাহু আন্দোলন করে যে তারও বুকে ভয় জাগে। শরীরের নিম্নভাগ বিকলাঙ্গ হওয়ায় হরকিঙ্করের দুই বাহু অত্যন্ত সুগঠিত।

রায়বাড়ির এই অংশের কথা আর কেউ চিন্তা করে না। তৃতীয় কর্তার অস্তিত্ব বোঝা যায় যখন এক-একদিন খাঁ খাঁ দুপুরে অথবা নিস্তব্ধ মধ্যরাত্রে এক ধরনের গোঙানি মেশানো কান্না সমস্ত বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে। তখন চাকরের ভোলাবার সব চেষ্টা

বিফল হয়ে পড়ে, তারাসুন্দরীকে না দেখা পর্যন্ত হরকিঙ্কর শান্ত হয় না। তারাসুন্দরী দেওরের মাথায় হাত বুলিয়ে চোখের জল মুছিয়ে দিলে সে সত্যিকারের ছেলেমানুষের মত শান্ত হয়। রাত্রের কান্নার সময় কোন সমস্যা হয় না কারণ তখন বড় কর্তা রামকিঙ্কর বাড়ি থাকেন না। কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁর দ্বিপ্রহরের ঘুম ভাঙিয়ে যখন হরকিঙ্কর কান্না শুরু করে তখনই বিপাকে পড়েন তারাসুন্দরী।

এই বাড়িতে তিনি যখন প্রথম আসেন তখন নেহাৎই বালিকা, মাত্র দশ বছর বয়স কিন্তু এই শিশুটিও দুই পার হয়নি। তিন বছর বয়সে পিতাকে হারানোর পর সে তারাসুন্দরীর স্নেহের ছায়ায় বড় হতে লাগল। হরকিঙ্কর তাই একদিকে তারাসুন্দরীর ভাই আবার পুত্রের মতন। রায়বাড়িতে তখন কোন বর্ষীয়সী রমণী ছিলেন না। বালিকা তারাসুন্দরীকে তাই সব দায়িত্ব নিতে হয়েছিল। অত্যন্ত ছটফটে এবং দারুণ সুন্দর চেহারার এই দেওরটি তাঁর দিন রাতের সঙ্গী ছিল।

হরকিঙ্করের যখন পাঁচ বছর বয়স তখনই একদিন দুর্ঘটনাটা ঘটল। সকালে ছাদে বেড়াচ্ছিলেন তারাসুন্দরী, সঙ্গে হরকিঙ্কর। সবে ভোর হয়েছে। ওপারে গঙ্গার সবটাই অস্পষ্ট তখনও, এ বাড়িতে দাসদাসীরা উঠেছে কিন্তু রামকিঙ্করের যেন প্রথম রাত। কাজের চাপ না থাকায় প্রভাতের এই সময় তিনি ছাদে আসেন।

বিশাল প্রশস্ত ছাদ। ঘুম ভেঙে যাওয়ায় আজ হরকিঙ্কর তাঁর সঙ্গী হয়েছে। খোলা ছাদে দৌড়াদৌড়ি করছিল হরকিঙ্কর। গঙ্গার বুক ছুঁয়ে শীতল বাতাস বয়ে আসছে। ছাদে দাঁড়ালে চোখ জুড়িয়ে যায়। তন্ময় হয়ে সেদিকে তাকিয়েছিলেন হঠাৎ মনে হল তাঁর পেছনের ছাদ ফাঁকা। ঘুরে তাকিয়ে দেখলেন যে শূন্য ছাদে তিনি একা দাঁড়িয়ে আছেন। বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠল তাঁর। হরকিঙ্কর কি নীচে নেমে গেল ? ঠিক সেই সময় চাতাল থেকে একটা চাকর চিৎকার করে উঠল। হরকিঙ্কর ছাদ থেকে ভেতর বাড়ির চাতালে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেছেন। তৎক্ষণাৎ কবিরাজ মশাইকে খবর পাঠানো হল। সংজ্ঞাহীন দেহটি তখন রক্তাক্ত। রামকিঙ্করকে ঘুম থেকে তুললেন তারা-সুন্দরী। সে সময় তিনি যথেষ্ট মদ্যপান করলেও রাত্রিবাসটা বাইরে করেন না। রামকিঙ্কর দুর্ঘটনা মারাত্মক মনে করে চুঁচুড়া শহরের বিখ্যাত ইংরেজ ডাক্তারকে ডাকিয়ে আনলেন। বেশ কদিন যমে মানুষে টানাটানির পর শেষ পর্যন্ত চিকিৎসকরা জয়লাভ করলেন। বেঁচে গেল হরকিঙ্কর। কিন্তু কদিন বাদেই বোঝা গেল তার নিম্নাঙ্গ অবশ হয়ে গেছে, উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। মাথায় আঘাত পাওয়ার ফলে বাকশক্তি রহিত হয়েছে। অনেক চিকিৎসা চলল দীর্ঘদিন ধরে কিন্তু কোন ফল লাভ হল না। হরকিঙ্কর সেই থেকে এই রকম অদ্ভুত বিকলাঙ্গ এবং বোবা

হয়ে রয়েছেন। শুধু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর একটি মাত্র পরিবর্তন হয়েছে, অকারণে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন. মাঝে মাঝে সেই রাগ কমানো তারাসুন্দরীর পক্ষেও দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে।

তখন ঠিক অপরাহ্ন নয়। বড়কর্তা দরাজ গলায় গান গাইছিলেন। মল্লারের ওপর তাঁর ভালবাসা একটু বেশী। ইদানীং শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বিশুদ্ধতায় না থেকে তিনি রাগরাগিণী ভেঙে বাংলা গান রচনা করেন। কোলকাতা শহরে এই ধরনের গানের চলন হয়েছে। গতকাল রাত্রে আতরবালার ঘরে গানটা তার মাথায় এসেছিল। আতরের নিজস্ব তবলচি বাজনাদার আছে। ভাল ভজন থেকে খ্যামটা সবই সে গাইতে পারে। নাচেও দারুণ। আজ দশ বছর আতর রামকিঙ্করের বাঁধা মেয়েমানুষ। আর কেউ সে ঘরে রামকিঙ্করের সঙ্গী না হয়ে প্রবেশ করতে পারে না। কাল আতর গাইছিল, 'পাখিকে বন্দী করলে, রাখলে ধরে তবু তার ভাষা শিখলে না।' এই ধরনের বাংলা গানের চটুলতার প্রতি এক কালে রামকিঙ্করের বিরাগ ছিল। এতে সঙ্গীত উপযুক্ত মর্যাদা পায় না বরং যারা

অক্ষম তারাই এতে আত্মগোপন করে। কিন্তু আতরের গাওয়ার ভঙ্গীতেই হোক অথবা কথাটার মধ্যে এমন কোন বেদনাই থাকুক এক সময় রামকিঙ্করকে স্পর্শ করল। আজ দুপুরে ঘুম ভাঙার পরই একটা কথা মাথার মধ্যে পাক খাচ্ছিল, সুর এসে যেতে সময় লাগল না। গানটা গাইলেন তিনি। তবলচি অবাক হয়ে বড়কর্তাকে এই ধরনের গান গাইতে শুনল। বুকের গভীরে রক্ত ঝরছে যার নতুন আঘাতে কি ক্ষতি করবে তার। খুব আন্তরিক না হলে মানুষ ওই কথা এমন সুরে গাইতে পারে না। কিন্তু বড়কর্তার দুঃখ পাওয়ার সুযোগ কোথায়? যে মানুষের সারা জীবনে সুখের গণ্ডীর বাইরে যাওয়ার দুর্ভাগ্য হয়নি সে কি করে অমন দুঃখের গান গায়? বোধ হয় অতিরিক্ত সুখ মানুষকে দুঃখের কাছাকাছি করে। গানটি শেষ হলে খানিকক্ষণ গুম হয়ে বসে থাকলেন রামকিঙ্কর। তারপর যেন সব ঝেড়ে ফেলতে প্রিয় মল্লার ধরলেন দরাজ গলায়। শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শাস্ত্রীয় মতেই গেয়ে চলছেন অনেকক্ষণ, দরজায় যে সরকার মশাই এসে দাঁড়িয়েছেন সেদিকে নজর নেই তাঁর।

পারতপক্ষে সরকার মশাই এই গান-ঘরের দরজায় আসেন না। দীর্ঘকাল রায়বাড়ির সেবা করে তিনি নিজের গুরুত্ব বোঝেন এবং অকারণে কাউকে বিরক্ত করার মানুষ নন। বিষয় সম্পত্তি এমন জিনিস যে মাঝে মাঝে নিজে স্বাধীনভাবে

সিদ্ধান্ত নেওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে। তার ওপর সেটা যদি অন্যের হয় তা হলে তো কথাই নেই। রায়েরা চিরকাল তাঁর ওপর বিশ্বাসের সঙ্গে সব কিছু ছেড়ে দিয়েছে। আজ অবধি প্রতিটি হিসাব নিখাদ হয়ে আছে। রামকিঙ্করের পিতা তাঁকে যথেষ্ট সময় দিতেন, পরামর্শ করা চলত। কিন্তু রামকিঙ্করের কাছে সময় পাওয়াই ভার। একমাত্র বিকেল বেলায় এই গানবাজনার পর বাইরের ঘরে তিনি ওঁর সঙ্গে কথা বলতে পারেন। কিন্তু সেখানে এত রকমের ধান্দাবাজ মানুষ উপস্থিত থাকে যে সব কথা খুলে বলাও যায় না। ফলে সরকার মশাই তারাসুন্দরীর ওপর নির্ভর করতে শুরু করেছেন। এই বাড়ির একমাত্র পুত্রবধূটি যথেষ্ট বুদ্ধিমতী। বাঙালী মেয়েরা যে এত বাস্তব সচেতন হয় তা ওঁকে না দেখে বোঝা যাবে না। সমস্ত অর্থ তিনি তারাসুন্দরীর হাতে সমর্পণ করেন এবং ইদানীং বিষয় সম্পত্তি নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনাও হয়। তারাসুন্দরীর মতামত খুব যুক্তিপূর্ণ। কিন্তু আজ এমন একটা ব্যাপার হয়েছে যে এই ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ানো ছাড়া উপায় ছিল না। বাইরের ঘরে আজ উমেদারদের ভিড় যেন উপচে পড়ছে।

রামকিঙ্কর গান শেষ করে পাশে ঢেকে রাখা সরবতের গ্লাস মুখে তুললেন। পরম তৃপ্তিতে সেটি পান করে জানলা দিয়ে গঙ্গার দিকে দৃষ্টি রাখলেন। রোদ সরে গেছে। ঘোলা জলে

ছায়া নামছে। অথচ সূর্য এখনও অস্ত হয়নি। একটু বাদে সূর্য যখন দিগন্তে মিলিয়ে যাবে অথচ অন্ধকার ঘনাবে না তখন সেই ছায়াময় শূন্য চরাচরে শুধু পাখিরা ব্যস্ত হয়ে থাকবে—রামকিঙ্করের সেটা বড় প্রিয় সময়। কাশির শব্দে মুখ ফিরিয়ে রামকিঙ্কর দরজায় দাঁড়ানো সরকার মশাইকে দেখতে পেলেন। দাঁড়ানোর ভঙ্গীতে সংকোচ আছে কিন্তু তবু বিরক্ত হলেন রামকিঙ্কর। এ ঘরে সরকার মশাই-এর আসা নিয়মবিরুদ্ধ। এখন কেউ তাঁকে বিরক্ত করতে পারবে না এটা সরকার মশাই-এর জানা আছে। তবু!

খুব শক্ত গলায় রামকিঙ্কর প্রশ্ন করলেন, 'এখানে কেন সরকার মশাই?'

মাথা নীচু করে সরকার মশাই বললেন, 'ক্ষমা করবেন, বিষয়টা খুব জরুরী।'

রামকিঙ্কর বিকৃত গলায় বললেন, 'জরুরী বিষয়ে যদি সিদ্ধান্ত নিতে না পারেন তা হলে এ বাড়ীর সরকার হবার যোগ্যতা আপনার নেই বলতে হবে।'

সরকার মশাই রামকিঙ্করের দিকে তাকালেন। এত বছর এই বাড়িতে আছেন কিন্তু কখনো এ রকম শক্ত কথা শোনেননি। রামকিঙ্করকে তিনি জন্মাতে দেখেছেন। খুব ধীর গলায় তিনি উচ্চারণ করলেন, 'বেশ, তা হলে এই অযোগ্য লোককে

বিদায় দিন।'

চমকে উঠলেন রামকিঙ্কর। সরকার মশাই-এর মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারলেন খুব বাড়াবাড়ি করা হয়ে গিয়েছে। শৈশব থেকে তিনি এই বৃদ্ধকে দেখছেন, বাল্যকালে তাঁকে তুমি বললেও হঠাৎ যৌবনের শুরুতে কখন তিনি এক সময় সরকার মশাই-এর কাছে আপনি হয়ে গেছেন। এই লোকটির শক্ত হাত যে তাঁদের বিষয় সম্পত্তি রক্ষা করছে সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। রামকিঙ্কর দ্রুত উঠে সরকার মশাই-এর. সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমাকে মার্জনা করুন।'

অনেক কষ্টে নিজেকে সামলালেন সরকার মশাই। স্নেহ বড় অন্ধ। এই বংশের ওপর তাঁর এ রকম টান পড়ে গেছে যে এই মার্জনা চাওয়া সব প্রতিরোধ ভেঙে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। গলা পরিষ্কার করে সরকার মশাই বললেন, 'এইমাত্র একটি দুঃসংবাদ পেয়েছি।'

'কি সংবাদ ?' রামকিঙ্কর উদ্বিগ্ন হলেন।

'কোলিয়ারিতে বিরাট দুর্ঘটনা ঘটেছে। মাটির নীচে গ্যাস ছিল জানা যায়নি। হঠাৎ তাতে আগুন ধরে গিয়ে বিস্ফোরণ ঘটেছে। শুনলাম পঞ্চাশ জনের মত শ্রমিকের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটেছে। সমস্ত এলাকায় ধিকিধিকি আগুন জ্বলছে। এর পরিণতি কি হবে বুঝতে পারছেন ?' সরকার মশাই স্পষ্ট

চোখে তাকালেন।

চট করে অর্থটা ধরতে পারেননি রামকিঙ্কর। কোলিয়ারিতে অগ্নিকাণ্ড হয়েছে সেটা নিশ্চয়ই খারাপ খবর কিন্তু এতে বিপদের কি আছে?

অর্থটা ধরিয়ে দিলেন সরকার মশাই, 'আমাদের বাৎসরিক আয় এবার বন্ধ হয়ে গেল। আপনি জানেন এই অঞ্চল আমরা যাকে কমিশনে দিয়েছিলাম সে এবার ব্যবসা গোটাবে। আগুন না নেবালে আর কয়লা তোলা যাবে না। এই প্রাকৃতিক আগুন নেবাতে পারলেও কি আর কয়লা অবশিষ্ট থাকবে? তখন ওই জমি বাতিল করে দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না। লক্ষ টাকা বন্ধ হওয়া মানে শুধু ওই জমির ওপর নির্ভর করা—তাতে এই বাড়ির এক মাসের খরচ মিটবে বলে মনে হয় না।'

রামকিঙ্কর সাময়িকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে গেলেন কথাটা শুনে। কিন্তু একটু বাদেই তাঁর মুখে হাসি ফুটল, 'তাতে ভয় পাওয়ার কি আছে, আপনি এত ভেঙে পড়ছেন কেন সরকার মশাই। আপনি ভুলে যাচ্ছেন রায়বাড়িতে লক্ষ্মী চিরকাল বাঁধা আছে। যদ্দিন তিনি এ বাড়িতে থাকবেন তাদ্দন এসব চিন্তা করার কোন মানে হয় না। তাঁর ইচ্ছামত অর্থের অভাব কোন দিনই আমাদের হবে না।'

সরকার মশাই মুখ তুললেন, তাঁর দ্বিধা স্পষ্ট. 'কিন্তু—। আমি তো বুকে বল পাচ্ছি না। কর্তার কাছে শুনেছিলাম দেবীকে পুজো দিয়ে তুষ্ট করতে হবে। কিন্তু সে ব্যবস্থা না হলে কি দেবী—'

হাত নেড়ে তাঁকে থামিয়ে দিলেন রামকিঙ্কর, 'হ্যাঁ, সে চিন্তা আমি করেছি। মেজকর্তা বিবাহ করবে না শুনলাম। আপনি অবিলম্বে ছোট কর্তার জন্য সুন্দরী সুলক্ষণা পাত্রী দেখুন। দশ বছরের মধ্যে বয়স এবং রজস্বলা হয়নি এমন পাত্রী চাই। ছোটকর্তা বিকলাঙ্গ হওয়ায় যৌন সংসর্গের কোন সম্ভাবনা নেই। অতএব দেবীর পূজা পূর্বপুরুষের আদেশ অনুসারেই হবে।'

সরকার মশাই-এর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুখ স্বাভাবিক হতে গিয়েও হল না, 'কিন্তু—'

'আবার কিন্তু কিসের?' কোন রকম দ্বিধা ঠিক সহ্য হয় না বড়কর্তার।

কথাটা বলতে সঙ্কোচ হচ্ছিল বড়কর্তার মুখের ওপর। মানুষ যদি অন্ধ হয় ইচ্ছে করে তবে তাকে চোখ খোলানো কষ্টকর হয়ে পড়ে। সরকার মশাই কোন রকমে নিবেদন করলেন, 'আমাদের ছোটকর্তার শরীরের কথা এ শহরের কোন মানুষের অজানা নয়। এ রকম পাত্রের সঙ্গে কোন বাবা তার মেয়ের বিয়ে দিতে সম্মত হবে বলে মনে হয় না।'

চিৎকার করে উঠলেন বড়কর্তা, 'আপনার মুখ থেকে এ ধরনের কথা শুনব আমি আশা করিনি। আশী বছরের ঘাটের মড়ার সঙ্গে দশ বছরের মেয়ের বিয়ে হয় কি করে? অর্থের জন্য, কুলীন পাত্রে জন্য, আইবুড়ো নাম ঘোচানোর জন্য। আমাদের সংসারে লক্ষ্মী বাঁধা হয়ে আছে, এ ঘরে এলে কোন মেয়ে রাণী না হয়ে যাবে না—এ কথাটাও কারো অজানা নয়। আর কে বলতে পারে বিয়ের পর ছোটকর্তা আবার তার স্বাভাবিক চেহারা ফিরেও পেতে পারে।' শেষ কথাটা বলার সময় নিজের কানেই বেসুরো ঠেকল তাঁর। কিন্তু রামকিঙ্কর নিঃসন্দেহ দেবীর আশীর্বাদে ছোটকর্তার পাত্রীর অভাব হবে না। রায়বাড়ি এই শহরে একটা প্রবাদ।

সরকার মশাই বললেন, 'আপনি যা বললেন তা সবই সত্যি কথা। হয়তো ছোটকর্তার জন্য পাত্রী পাওয়া যাবে তবে সে পাত্রী পালটি ঘরের হবে বলে মনে হয় না। কোন অবস্থাপন্ন মানে আপনাদের সমকক্ষ কেউ এ বাড়িতে মেয়ে দেবে না।'

রামকিঙ্কর ফুঁসে উঠলেন, 'আমাদের সমকক্ষ? আছে নাকি এই বাংলাদেশে? কার বাড়ীতে লক্ষ্মী বাঁধা আছে? আর সেরকম যদি হয় তা হলে পালটি ঘরের কি দরকার! সুন্দরী সুলক্ষণা পাত্রী আনুন—তা হলেই চলবে। বিবাহ এই শ্রাবণেই

হবে যাতে আগামী কোজাগরী পূর্ণিমায় দেবীর পূজা সম্পন্ন হতে পারে।'

কথা শেষ করে এক মুহূর্ত দাঁড়ালেন না বড়কর্তা। সন্ধ্যে হয়ে এল বলে। আজ তাঁর দেরি হয়ে গেছে, গানটা মাথায় রাখতে হবে।

বড়কর্তার জুড়িগাড়ি বেরিয়ে গেলে সরকার মশাই তারাসুন্দরীকে খবর পাঠালেন। সন্ধের সময় তারাসুন্দরীর রাজেন্দ্রাণীর বেশ দেখলেই মাথা নত হয়ে আসে। সরকার মশাই সব ঘটনা একে একে নিবেদন করে বললেন, 'আপনি কি বলেন মা?'

তারাসুন্দরী পাথরের মত বসে ছিলেন। কয়লা খনির আয় বন্ধ হওয়া মানে এই সংসার তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়বে। তিনি নিজেও বড় ঘরের মেয়ে, অভাবের সঙ্গে কোন কালে পরিচয় ছিল না। কিন্তু তবু বাস্তব বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ হওয়ায় পরিস্থিতি চট করে বুঝতে পারেন। আজ যদি এই সংসারের কর্তাদের খরচ কমাতে বলেন তা হলে তাঁরা উন্মাদ

হয়ে যাবেন। অর্থের যোগান নিয়মিত থাকা দরকার। তিনি সরকার মশাইকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওই অঞ্চলটা বিক্রি করা যাবে কি না একবার দেখবেন?'

সরকার মশাই বললেন, 'যা শুনলাম কেউ আগুনে টাকা ফেলবে না। তবু আমি আগামীকাল একবার ঘটনাস্থলে যাব।'

তারাসুন্দরী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'কেন এমন হল! আপনার কি মনে হয় দেবী এই বংশের ওপর কোন কারণে অসন্তুষ্ট হয়েছেন?'

সরকার মশাই নিজের মনে ঘাড় নাড়লেন, 'কর্তার কাছে শুনেছিলাম, সেই তান্ত্রিক বগলাচরণ নাকি উপদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন কখনই যেন এই বংশের মানুষ অহঙ্কারী না হয়। অহঙ্কার বড় সর্বনাশের সিঁড়ি।'

তারাসুন্দরী বললেন, 'অহঙ্কার? তেমন কোন ঘটনা ঘটেছে কি?'

সরকার মশাই তাকালেন, 'হ্যাঁ মা। আমরা সবাই বলি দেবী আমাদের কাছে বাঁধা আছেন, আমাদের কোন অভাব হবে না। কথাটা ঠিক, কিন্তু তাই বলে বড়াই করা কি অহঙ্কার নয়? বড়কর্তা যখন দান করেন তখন তাঁর হুঁশ থাকে না, আবার যখন ধার করেন তখন অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করেন না।'

তারাসুন্দরীর গলায় বিস্ময় ফুটে উঠল, 'বড়কর্তা ধার

করেন ?'

সরকার মশাই মাথা নাড়লেন, 'হ্যাঁ মা। উনি যার কাছে টাকা চাইবেন সেই তা দিয়ে দেবে, কারণ সবাই জানে এ বাড়িতে লক্ষ্মী বাঁধা আছে, চাইলেই পাওয়া যাবে। আমি যদ্দুর জানি তাঁর কাছে পাওনাদাররা প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা পাবে। এটা কি অহংকার নয় ? দেবীর নাম ভাঙিয়ে টাকা নেওয়া দেবী কি সহ্য করবেন ?'

তারাসুন্দরী বিহ্বল গলায় বললেন, 'এত টাকা নিয়ে উনি কি করেন ?'

হাসলেন সরকার মশাই, 'কিছুতে নিজের খেয়াল মেটান, বাকীটা উদার হাতে দান করেন। কিন্তু পাওনাদাররা টাকা চাইলেই বিপদে পড়তে হবে।'

তারাসুন্দরী চোখের সামনে অন্ধকার দেখলেন। কয়েক মুহূর্ত পর নিজেকে কোন রকমে সামলে নিয়ে বললেন, 'তা হলে আর দেরী করে লাভ নেই, দেবীর পূজা করা দরকার। তিনি যদি সন্তুষ্ট না হন তা হলে এ সংসার ভেসে যাবে।'

সরকার মশাই বললেন, 'তা হলে আপনিও ছোটকর্তার বিবাহের কথা বলছেন।'

তারাসুন্দরী মাথা নাড়লেন, 'তা ছাড়া তো আর কোন উপায় নেই। মেজকর্তা কখনই সম্মত হবেন না। আর তিনি যে

কাজে নিজেকে সমর্পণ করেছেন তাতে আমি আর বিঘ্ন সৃষ্টি করতে চাই না। দেশের কাজ অনেক বড় কাজ। আমি জানি ছোটকর্তার সঙ্গে বিয়ে দেওয়া মানে মেয়েটির সুখ আহ্লাদ বিসর্জন দেওয়া কিন্তু এটা আমাদের করতেই হবে। কত মেয়েকে বিয়ের নামে হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দেওয়া হয় এটা কি তার চেয়ে খারাপ হবে? বোধ হয় দেবীর এই রকম ইচ্ছা।'

সরকার মশাই বললেন, 'বেশ, আমি পাত্রীর সন্ধান করছি।'

ছোটকর্তার বিয়ের চেষ্টা শুরু হয়ে গেল পুরোদমে। মেজকর্তা বিয়ে করবেন না কিন্তু তাঁকে মেয়ে দিতে কলকাতা থেকে বড় বড় ঘরের সম্বন্ধ আসত, এখনও আসছে। ছোটকর্তার বিয়ের কথা শুনে সবাই থমকে গেল। সমান কোন ঘর থেকে বিন্দুমাত্র সাড়া পাওয়া গেল না। অথচ শ্রাবণ মাস প্রায় শেষ হতে চলল দেখে সরকার মশাই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন।

এই সময় খবর এল দক্ষিণে রায়েদের যেখানে জমি জমা সেখানে পিতৃমাতৃহীনা একটি অপরূপা বালিকা আছে। কালবিলম্ব না করে সরকার মশাই সেখানে ছুটলেন। বালিকাকে

দেখেই চমকে উঠলেন তিনি। সাক্ষাৎ লক্ষ্মী প্রতিমা। যেমন তার মুখের গড়ন তেমনি তার গায়ের রঙ। দশ বছর বয়স। মাথায় এক ঢাল কালো চুল। যেন দেবী এই কাজের জন্যই মেয়েটিকে সৃষ্টি করেছিলেন। মাতুলালয়ে অত্যন্ত হেনস্থার মধ্যে থাকে মেয়েটি। মামার অবস্থা খুবই নিঃস্ব বলে পাত্র জোটেনি। শেষ পর্যন্ত ঠিক হচ্ছিল যে, গ্রামেরই এক তেজবরে পাত্রের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে দেওয়া হবে কারণ তাতে কোন খরচ হবে না। সরকার মশাই মেয়েটির মামাকে ডাকিয়ে এনে গম্ভীর ভাবে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। রায়বাহাদুর কালীকিঙ্কর রায়ের বংশধরের সঙ্গে বিবাহের কথা পাত্রীর মামা খুব কষ্ট করেও স্বপ্ন দেখতে পারতেন না। ছেলেটির নাকি সামান্য খুঁত আছে। এত বড় বংশের ছেলে যার বয়স মাত্র সতের তার সামান্য খুঁতে কি এসে যায়। হীরের আংটি যত বাঁকা হোক তার মূল্য বিন্দুমাত্র কমে না। বিগলিত মামা রাজী হয়ে গেল। ভাগ্নী যদি রাজেন্দ্রাণী হয় তা হলে ভবিষ্যতে তার কত উপকার হতে পারে। গ্রামের মানুষ ঈর্ষান্বিত হল, জন্ম মৃত্যু বিবাহ—এই তিন নিয়ে যে ভবিষ্যৎবাণী করা যায় না তা আবার প্রমাণিত হল।

সরকার মশাই মামাকে বললেন, এত দূরে এসে তাঁদের পক্ষে বিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। তিনি সব খরচ দিচ্ছেন, মামা যেন অবিলম্বে ভাগ্নী নিয়ে চলে আসেন। সেখানেই বিবাহ হবে

রায়বাড়ির অর্থে। বিখ্যাত বংশের বিয়ে হেলাফেলা করে দিলে চলবে না। পাত্রী এখনও রজস্বলা হয়নি নিশ্চিন্ত হয়ে সরকার মশাই চুঁচুড়ায় ফিরে এলেন। পাত্রীর নাম হেমপ্রভা। কদাচিৎ নামের সঙ্গে মানুষের মিলন হয়, এ ক্ষেত্রে নামটাই যেন কন্যার তুলনায় অনেক নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে।

ছোটকর্তার বিবাহ উপলক্ষে রায়বাড়িতে যে জাঁকজমক হল তা চুঁচুড়ার মানুষ অনেক দিন দেখেনি। রামকিঙ্করের বিবাহে প্রাচুর্য ছিল, দু হাজার মানুষ খেয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এমন করে সেটা গল্প কথা হয়নি। রামকিঙ্কর সরকার মশাইকে দরাজ হতে বলেছেন, দেবীর পূজার এটা একটা প্রধান অঙ্গ, এখানে কোন ত্রুটি রাখলে চলবে না। জমানো টাকা ফুরিয়ে গেলে ধার করতে কোন দ্বিধা নেই, কোজাগরী পূর্ণিমার শেষে আর কোন অভাব থাকবে না, এই সংসার কুবেরের সমকক্ষ হবে।

পাত্রীকে নিয়ে তার মামা পৌঁছে গেছে যথাসময়ে। শহরের আর এক প্রান্তে একটি বাড়িতে তাদের রাখা হয়েছে। সরকার মশাই রামকিঙ্করকে অনুরোধ করেছিলেন বিবাহের আগে একবার·

পাত্রীকে দেখে আসতে। রূপের বর্ণনা তিনি যা করেছেন তা একবার মিলিয়ে নেওয়া কর্তব্য, কারণ এই বংশের বধূ হয়ে যে আসছে তার নির্বাচন বড়কর্তার দ্বারাই হওয়া উচিত।

রামকিঙ্কর কিন্তু এক কথায় না বলে দিয়েছেন। হাজার হোক তিনি সম্পর্কে ভাসুর হবেন। ভাদ্রবউ-এর মুখ দর্শন করা গর্হিত কাজ হবে। সরকার মশাই-এর ওপর যথেষ্ট আস্থা আছে অতএব পাত্রী না দেখলেও চলবে।

শেষ পর্যন্ত সরকার মশাই তারাসুন্দরীকে রাজি করাতে পারলেন। সাধারণত বাড়ির মেয়েরা বিয়ের আগে কনেকে দেখতে যান না, সে নিয়ম নেই। পালকিতে চেপে গোপনে তারাসুন্দরী সন্ধ্যে পার হয়ে হেমপ্রভাকে দেখতে গেলেন। হরকিঙ্করের যে স্ত্রী হবে, বায়বাড়ির সেই ছোট বধূকে একবার চাক্ষুষ দেখার ইচ্ছে তাঁরও ছিল। লোকলজ্জাবশত মুখে না বললেও শেষ পর্যন্ত তাই রাজি হয়ে গেলেন। ব্যাপারটা এমনকি রামকিঙ্করের কাছেও গোপন রাখা হল।

হেমপ্রভাকে দেখে তারাসুন্দরীর মুখে প্রথমে কথা ফুটল না। এত সুন্দর কোন মানুষ হয়। নিজে সুন্দরী বলে তাঁর যে ধারণা ছিল এক মুহূর্তে তা নিঃশেষ হয়ে গেল। এ মেয়ে অন্ধকারে হেঁটে গেলেও চারধার আলোকিত হবে। ঠিক লক্ষ্মীপ্রতিমার মত মুখের গড়ন কিন্তু বালিকাসুলভ চাপল্য তাতে মাখানো।

মাথার চুল অজস্র ঢেউ হয়ে প্রায় গোড়ালি ছুঁয়েছে। মুগ্ধ চোখে তারাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার নাম হেমপ্রভা?'

দ্রুত ঘাড় নেড়ে মেয়ে জবাব দিল, 'হ্যাঁ, সবাই ডাকে মুখপুড়ি বলে।'

'মুখপুড়ি?' হাসি চাপতে পারলেন না তারাসুন্দরী।

'হ্যাঁ। আমি নাকি খুব সুন্দরী, অতি বড় সুন্দরী না পায় বর, তাই মুখপোড়ায়।'

কথা বলার ভঙ্গিতে ছেলেমানুষী স্পষ্ট। গলার স্বর খুব মিষ্টি কিন্তু বোধ হয় দারিদ্র্যের মধ্যে মানুষ হওয়ায় একে কেউ সহবৎ শেখায় নি।

তারাসুন্দরী তৎক্ষণাৎ স্থির করলেন এ মেয়ের নতুন নামকরণ করতে হবে। রায়বাড়িতে যখনই কোন মেয়ে বধূ হয়ে আসে তখনই তার আইবুড়ো নাম বাতিল হয়ে যায়। তারাসুন্দরীর নিজেরও অন্য নাম ছিল, এতদিনের অব্যবহারে সেটা প্রায় ভুলেই গিয়েছেন। তিনি হেসে বললেন, 'হেমপ্রভা নামটা ভাল, মুখপুড়ি অবশ্য খুব খারাপ। কিন্তু আমরা তোমার অন্য নাম রাখবো। আজ থেকে তোমার নাম লক্ষ্মী।'

'ওমা, সে তো ঠাকুরের নাম!' মেয়ের চোখে বিস্ময়।

তারাসুন্দরী হেসে বললেন, 'তাই তো। তুমি সেই ঠাকুরের পুজোর জন্যেই তো জন্মেছ।'

লক্ষ্মী হাত-পা নেড়ে বলল, 'আমি বাবা কোনদিন পুজোটুজো করিনি।'

'আচ্ছা।' তারাসুন্দরীর মজা লাগল, 'তুমি কি কি পারো?'

'আমি?' ভাবতে বসল লক্ষ্মী, 'আমি রাঁধতে পারি, মোচার ঘণ্ট, লাউ-এর তরকারি, নিজে নিজে চুল বাঁধতে পারি, আবার খুব উঁচু আমগাছেও উঠতে পারি।'

'বাঃ খুব ভাল কথা। তবে তোমাকে আমাদের ওখানে গিয়ে এ সব কিছুই করতে হবে না। এর চেয়ে সহজ একটা কাজের ভার তোমাকে দেওয়া হবে।' তারাসুন্দরী জানালেন।

'এর চেয়ে সহজ? কি মজা! কি কাজ গো?'

'এই ধরো, তোমার চেয়ে সাত বছরের বড় একটা ছেলেকে স্নান করিয়ে দিতে হবে, খাওয়াতে হবে, দেখাশোনা করতে হবে। ব্যাস!'

'ওমা সে কি! আমার চেয়ে সাত বছরের বড় যে সে তো একজন ব্যাটাছেলে। তাকে ও সব করাতে যাব কেন? তার নিজের হাত-পা নেই?' অবাক হল লক্ষ্মী।

'ছিল কিন্তু ভগবান সেগুলো নষ্ট করে দিয়েছেন।'

কথা শেষ করে তারাসুন্দরী আর অপেক্ষা করলেন না। এরকম একটা মেয়ের স্বামী হিসেবে হরকিঙ্করকে কল্পনা করতেও বুক হিম হয়ে যায়। কিন্তু দেবীর যদি তাই ইচ্ছে হয় তাহলে

সেটাই মেনে নেওয়া উচিত। একমাথা ঘোমটা দিয়ে তিনি পালকিতে উঠতেই সরকার মশাই দুটো হাত জোড় করে নীচু স্বরে বলে উঠলেন, 'মা, আমার ভুল হয়নি তো ?'

পালকিতে বসে তারাসুন্দরী জবাব দিলেন, 'দেবীর পুজোর এর চেয়ে ভাল উপচার আর কি হতে পারে সরকার মশাই ?'

বাড়ি ফিরে তারাসুন্দরী সোজা দোতলায় চলে এলেন। বারান্দার এক প্রান্তে হরকিঙ্করের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে একটু থিতিয়ে নিলেন তিনি। ঘর থেকে কোন শব্দ আসছে না। হরকিঙ্কর কি এর মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল ! নিঃশব্দে ঘরে ঢুকেই তারাসুন্দরী ঠোঁট কামড়ালেন। একটা বিরাট দোলনায় হরকিঙ্করকে শুইয়ে দিয়ে তার চাকর দোল দিচ্ছে। শিশুর মত হরকিঙ্কর চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে। বোঝা যাচ্ছে ছোট কর্তার ঘুমের আয়োজন চলছে এখন। হঠাৎ নিজের অজান্তে তারা-সুন্দরীর দু চোখ থেকে বন্যার মত জলের ধারা নেমে এল গালে। তারপর, যেমন নিঃশব্দে এসেছিলেন তেমনি বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল,

তিনি নিছক বোকার মত কেঁদে ফেললেন। একদিকে লক্ষ্মী তো অনেক ভাগ্য নিয়ে এ বাড়িতে আসছে। আমৃত্যু সে চোখের সামনে সব সময় স্বামীকে দেখতে পাবে। এরকম ভাগ্য ক'টা মেয়ের হয়। দ্রুত হাতে জল মুছে ফেললেন তিনি।

বিবাহে সবাইকে নিমন্ত্রণ করা হয়ে গেছে। সকাল থেকে বাড়িতে সাজ সাজ রব। প্রচুর মানুষের আনাগোনা চলছে। একমাত্র মেজ কর্তাকে খবর দেওয়া সম্ভব হয়নি। কলকাতায় তিনি যে ডেরায় আগে থাকতেন তারাও কোন খবর দিতে পারেনি। তাঁর কর্মক্ষেত্র এখন বিরাট, চট করে হদিশ পাওয়া সম্ভব নয়। তারাসুন্দরীর এই ব্যাপারে মন খুঁত খুঁত করছিল। মেজকর্তা নিজে বিয়ে না করুক ছোট কর্তার বিয়ের খবরটা তাঁর জানা উচিত ছিল। কিন্তু সরকার মশাইও শেষ পর্যন্ত বিফল হলেন।

প্রথমে ঠিক ছিল, ছোট কর্তাকে নিয়ে শোভাযাত্রা করে বরযাত্রীরা যাবে যে বাড়িতে মেয়েকে রাখা হয়েছে সেখানে। কিন্তু সরকার মশাই-এর কথায় শেষ পর্যন্ত পরিকল্পনার বদল হল।

বিয়ের দিন সকালে এলেন মেয়ের মামা মেয়েকে নিয়ে এ বাড়িতে। রায়বাড়ি ছুটো ভাগ হয়ে গেল। একদিক মেয়েপক্ষের অন্যদিক পাত্র পক্ষের। তারাসুন্দরী নিজের হাতে ছেলেকে সাজিয়ে দিলেন। যে ছেলের মুখ থেকে কথা বলতে গেলেই লালা গড়ায় সে আজ একদম অন্যরকম। পিঁড়িতে বসিয়ে যখন ছাঁদনাতলায় নিয়ে আসা হল তাকে দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল সবার। এমন সুদর্শন স্বাস্থ্যবান তরুণ কথা বলতে পারে না, কোমরের নীচ থেকেই যার শুকনো—ভাবলেই বুক টন টন করে উঠছিল আগন্তুকদের। বিয়েটা হয়ে গেল। পাত্র মন্ত্র পড়তে পারল না কিন্তু পুরোহিত বললেন, মৌনতাই সম্মতির লক্ষণ। অতক্ষণ রইল, তবু হরকিঙ্কর সামান্য বেয়াদপি করেনি। মুগ্ধ চোখে চারপাশে তাকিয়েছে তারপর যখন কনে এল তখন যেন তার চোখ সরে না।

বিয়ের সাজে আজ লক্ষ্মীকে কিছুতেই মানুষ বলে মনে হচ্ছে না। যেন এক লক্ষ চাঁদ আর পৃথিবীর সব ফুল নিজেদের রূপহীন করেছে ওর জন্যে। দশ বছরের বালিকা বেনারসী শাড়ির মোহিনীমায়ায় যেন পূর্ণ যুবতীর চমক পেয়ে গেছে। ভ্রাতৃবধূর মুখদর্শন অশোভন তবু একবার চেয়ে দেখলেন রামকিঙ্কর। আজ তিনি অনেক বছরের মধ্যে প্রথম রাত বাড়িতে আছেন। অস্বস্তি হচ্ছে, শরীর আইঢাই করছে, যদিও

তাঁর ঘরে পানীয় মজুত রয়েছে তবু এতক্ষণ সব কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল। নতুন বউ-এর মুখ নজরে দেখার পর তাঁর শরীরে বিদ্যুত প্রবাহিত হল, এ যে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী প্রতিমা! বুক ভরে গেল তাঁর, যাক, আর কোন ভয় নেই। তারাসুন্দরী তাঁকে নিশ্চিন্ত করেছেন। এ রজস্বলা হবার আগেই কোজাগরী পূর্ণিমা এসে যাবে।

বাসর ঘরে মেয়েরা রসিকতা করেই, তবে সেটা বরের সঙ্গে। এক্ষেত্রে ঠিক উল্টোটা হল। মেয়েরা পড়ল লক্ষ্মীকে নিয়ে। পাড়াপ্রতিবেশী মেয়েরা হরকিঙ্করের অবস্থা জানে। পাত্রের পেছনে তার চাকর সব সময় দাঁড়িয়ে আছে। ওর সঙ্গে রসিকতার চেষ্টা করা মানে ভস্মে ঘি ঢালা। অতএব লক্ষ্মীকে জ্বালানো শুরু হল।

একজন বলল, 'হ্যাঁ গো বউ, বরের সঙ্গে আলাপ করো!'

বিয়ের কনের চুপ করে বসে থাকাই নিয়ম। কিন্তু এ মেয়ে অন্য ধাতে গড়া। ক্যাঁট ক্যাঁট করে বলল, 'মেয়েছেলে নিজে থেকে পুরুষের সঙ্গে কথা বলে নাকি, এ দেশে কি এই নিয়ম?'

যে প্রশ্ন করেছিল সে তো বটেই ঘরের আর সবাই থ হয়ে গেল কথাটা শুনে। নতুন বউ এত তেজের সঙ্গে কথা বলল! সেকি জানে না, তার বর কথা বলতে পারে না। একজন ঠাট্টাটা জিইয়ে রাখতে চাইল, 'তা না হয় আলাপ করিয়ে দিই'।

এই হল তোমার বর, এর সঙ্গে সারা জীবন শুতে হবে, এই তোমার চোখের মণি। নাও, আলাপ করিয়ে দিলাম, এবার দেখি কেমন কথা বল।'

ঘোমটা সামান্য উঠে গেছে কপাল থেকে ; ডাগর চোখ তুলে লক্ষ্মী স্বামীকে দেখল। অনেকক্ষণ থেকে একইভাবে জড়ভরতের মত বসে থেকে আর পারছিল না হরকিঙ্কর। তার চাকর অবশ্য হেলান দেবার জন্য তার পেছনে দুতিনটে বড় বালিশ সাজিয়ে দিয়েছিল এখন সে তাতেই ভর রেখেছে। অনেক দিন বাদে এত পরিশ্রমে বোধ হয় তার ঘুম পেয়ে যাচ্ছিল, নতুন বউ তাকে দেখছে, বুঝতে পেরে সে চেয়ে থাকতে চেষ্টা করল কিন্তু পারল না। লক্ষ্মীর ভ্রূ কুঁচকে গেল। তার স্বামী সুস্থ নয়, কথা বলতে পারে না, এ খবর তার কানে গিয়েছিল। তাদের গ্রামে একটি বোবা ছেলে আছে যে কথা বলতে পারে না ; কিন্তু পৃথিবীর আর সব কাজ স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে অনেক ভালভাবে করতে পারে। তার স্বামী হয়তো তার মত হবে—এরকমটা ভেবেছিল লক্ষ্মী। কিন্তু হরকিঙ্কর শুয়ে পড়ায় তার কোমরের নীচের কাপড় সরে গেছে, দুটো কাঠির মত সরু বিবর্ণ পা নেতিয়ে পড়ে আছে সেখানে।

ঠিক সে সময় তারাসুন্দরী এসে পড়লেন দরজায়। এই সময়টার জন্যে কাঁটা হয়েছিলেন তিনি। এসেই তাড়া লাগালেন

মেয়েদের। প্রায় জোর করে ওদের শরীরের দোহাই দিয়ে সবাইকে পাঠিয়ে দিলেন খাওয়ার জায়গায়। ঘর খালি হয়ে গেলে দেখলেন ছুটো চোখ ওর দিকে অপলকে তাকিয়ে আছে; কিন্তু সে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। কারণ, তার ছু-চোখে সমুদ্র। তারাসুন্দরী আর পারলেন না, ছুটে গিয়ে নতুন বউকে জড়িয়ে ধরলেন। মেয়েটা তাঁর বুকের মধ্যে থর থর করে কাঁপছে নিঃশব্দে। ওদিকে হরকিঙ্কর তখন অথৈ ঘুমের অতলে।

॥ দুই ॥

গঙ্গার জল বয়ে যায়, সময় কারো জন্যে বসে থাকে না। এবং সময় হল এমন একটা ওষুধ যা সব রোগ সারিয়ে দেয়। তাই নতুন বউ দুদিন বাদেই আর এক নতুন জগতে প্রবেশ করল। এখন হরকিঙ্করের চাকরের ছুটি, শুধু মাঝে মধ্যে ছোটবাবুকে কোথাও নিয়ে যেতে হলে তার ডাক পড়ে। নতুন বউ স্বামীকে খাইয়ে দেয়, সাজায় এক একদিন এক এক রকম, ছড়া বলে ঘুম পাড়ায়। আর আশ্চর্য ব্যাপার, এ মেয়েকে সারাক্ষণ চোখের সামনে দেখে হরকিঙ্করের স্বভাবচরিত্র একদম পাল্টে গেছে। ভর দুপুরে অথবা গভীর রাতে তার সেই বুকফাটা চিৎকার আর শোনা যায় না। শুধু লক্ষ্মী যখন চোখের আড়াল হয় তখন তার ছটফটানি শুরু হয়। বউকে না দেখা পর্যন্ত সে শান্ত হয় না। তারাসুন্দরীর এই ঘরে আসার প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছে। লক্ষ্মী যে স্বামীকে নিয়ে ভুলে রয়েছে এতেই তার শান্তি।

বিয়ের আগে লক্ষ্মী পুতুল খেলতো। গ্রাম্য মেলা থেকে কিনে আনা মাটির পুতুল সেগুলো। এখন এমন একটা পুতুল

তার হাতে যে কাঁদে হাসে অথচ কথা বলে না। গলা জড়িয়ে আদর করলে তাকে আঁকড়ে ধরে এই মাত্র। গ্রামসুবাদে দিদিদের কাছে তার জানা হয়ে গিয়েছিল বিয়ের পর স্বামীরা কি কি কম করেন। ভয় যেমন ছিল তেমনি শিহরন কম ছিল না। এখানে এসে প্রথম রাতের পরই সে টের পেয়ে গেল ওসব হরকিঙ্করের কাছ থেকে কোনদিন পাবে না। দশ বছরের মেয়ে এতে নিশ্চিত হল। যেন খুব বড় ফাঁড়া কেটে গেল তার। এক অন্যরকম মজা পেয়ে গেল সে হরকিঙ্করের সঙ্গে খেলাতে। এ পুতুল রাগ করলে বোঝে, খুশী হলে টের পায়, শুধু কখনো সখনো লক্ষ্মী যদি অভিমান করে তখন হরকিঙ্করের মাথায় কিছুই ঢোকে না, ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে।

এ বাড়িতে লক্ষ্মীর দিন তাই ভালই কাটছে। এত বিরাট বাড়ি আর তার বড় বড় ঘরে সে থাকতে পারবে কোনদিন ভাবেনি। শুধু একটা জিনিসে মাঝে মাঝে খুব রাগ হয়ে যায় তার। তারাসুন্দরী তাকে একতলায় নামতে নিষেধ করেছেন। এমন কি দিনের বেলায় বারান্দায় টোটো করে ঘোরাও চলবে না। বড় ভাসুর নাকি খুব রাগী মানুষ, বাড়ির বউএর এসব পছন্দ করেন না। বিকেলে তাঁর গান শুনেছে লক্ষ্মী। যখন আ আ করে গান তখন একদম ভাল লাগে না ওর। কিন্তু যখন বাংলা কথায় সুর বসে তখন কান জুড়িয়ে যায়। যে মানুষ অমন সুন্দর

গান গায় সে আবার রাগী হয় কি করে! চুরি করে দেখেছে লক্ষ্মী, সন্ধ্যেবেলায় রাজার মত সেজেগুজে বড় ভাসুর দিদির কাছে আসেন, পাঁচ মিনিট থাকেন তারপর নীচে নেমে যান।

তারাসুন্দরীকে তার খুব ভাল লেগেছে। কিন্তু ওঁর উপদেশগুলো মোটেই ভাল লাগে না। এ বাড়িতে নাকি লক্ষ্মী বন্দী হয়ে আছেন। আগামী কোজাগরী পূর্ণিমার দিন তাকে সেই লক্ষ্মীর পুজো করতে হবে। তিন পুরুষ ধরে নাকি এ বাড়ির কেউ তাঁর পুজো করেননি। সব দায়িত্ব তাই লক্ষ্মীর ওপর পড়েছে। এই জন্যে তাকে এ বাড়িতে আনা। সে পুজো ভালভাবে করলে কোন অভাব আর থাকবে না। তারাসুন্দরী তাকে বুঝিয়েছেন দেবী প্রসন্ন হলে হয়তো হরকিঙ্কর সুস্থ হয়ে উঠবে, কথা বলতে পারবে। প্রথম প্রথম এসব কথা শুনলে ভয় হতো, পুজোটুজো কোনদিন করেনি সে। পুরুতমশাই নাকি দেখিয়ে দেবেন—তবু! কিন্তু স্বামী সুস্থ হয়ে যাবে শোনার পর সে অনেক স্থির হয়ে গেছে। স্বামীকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে নিষেধ করেছেন তারাসুন্দরী। পুজোর আগে ওসব করলে দেবী রাগ করতে পারেন। আদর পেয়ে পেয়ে হরকিঙ্কর ছেলেমানুষের মত নাকী কান্না কাঁদে আদরের জন্য। কিন্তু লক্ষ্মী নিজেকে সংযত করতে শিখে ফেলেছে। আর তো মোটে দেড়টা মাস।

আজ পূর্ণিমা। মাঝখানে একটা অমাবস্যা চলে গেলেই উৎসবের মাস। দুর্গাপুজো পার হলেই কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো। সেই রাত্রে এই বংশের মানুষ পূর্ণ আহুতি দেবে দেবীকে। দেবী সন্তুষ্ট হবেন অনেক বছর বন্দী থাকার পর। কুবেরের সমকক্ষ হবে রায়েরা। লক্ষ্মীকে তাই চোখে চোখে রাখেন তারাসুন্দরী। যা চঞ্চল ছুটোছুটি করতে গিয়ে আবার শরীরে আঘাত না লাগিয়ে বসে।

এ মাসে কোলিয়ারীর মাসিক কিস্তিটা আসে নি। তারাসুন্দরীর হাত প্রায় খালি। দক্ষিণের জমিটায় আবার কি সব গোলমাল লেগেছে। গোপনে সরকার মশাইকে দিয়ে গহনা বিক্রী করিয়েছেন তিনি। আর তো মোটে একটা মাস, তারপর দেবী দশগুণ করে সব ফিরিয়ে দেবেন। কিন্তু রামকিঙ্করের কাছে এসব কথা বলা বৃথা। তিনি প্রত্যহ সন্ধ্যার তারাসুন্দরীর সামনে যখন হাত পাতেন তখন তাঁকে অন্নপূর্ণা মনে হয়। একটার পর একটা গহনা তাই চলে যাচ্ছে কে জানে, মন খুঁত খুঁত করে। কিন্তু ভীষণভাবে বিশ্বাস করেন

তারাসুন্দরী কোজাগরী পূর্ণিমার রাতটার জন্য—তার এখন শবরীর প্রতীক্ষা।

আজ পূর্ণিমা। সন্ধ্যে থেকে কিছুতেই হরকিঙ্কর স্ত্রীকে ছাড়তে চাইছিল না। তার সামনে বসে থাকতে হবে লক্ষ্মীকে। জানলা দিয়ে ফুটফুটে জ্যোৎস্না দেখতে পেয়ে লক্ষ্মীর মাথায় একটা মতলব এল। হরকিঙ্কর প্রায় সারা দিনরাত ঘরের মধ্যে বন্দী। একদিন তারাসুন্দরীর সঙ্গে বাড়ির ছাদে একমাথা ঘোমটা দিয়ে উঠেছিল সে। যদিও এ বাড়ির সমান বাড়ি ধারে কাছে আর একটাও নেই তবু আড়াল। সেখানে হরকিঙ্করকে নিয়ে গেলে কেমন হয়।

চাকরকে নির্দেশ দিয়ে লক্ষ্মী ছাদে নিয়ে এল হরকিঙ্করকে। বিরাট মাঠের মত দোতলার ছাদ এখন দুধের সরে মাখামাখি। যেন আকাশ ফুটো হয়ে অঢেল রূপোর স্রোত নেমে আসছে মাটিতে। লক্ষ্মীর মনে পড়ল এরকম জ্যোৎস্নার রাতে তারা উঠোনে পা ছড়িয়ে বসে চাঁদের কলঙ্ক দেখত। হরকিঙ্কর যে খুশী হয়েছে এখানে এসে তা ওর মুখ দেখে বোঝা যায়। আঙুল দিয়ে

চাঁদের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্মীকে দেখিয়ে যেই সে উত্তেজিত ভঙ্গিতে কিছু বলতে গেল অমনি গাল বেয়ে লালা গড়িয়ে এল। গোঙানি ছাড়া আর কিছু বোঝা যাচ্ছে না। সেই শব্দ এখন এই রূপকথার রাতে লক্ষ্মীর কানে অন্যরকম সুরে বাজল। শিশুকে যদি কথা শেখানো যায়, পাখীর মুখে যদি কথা ফোটে তবে এ ক্ষেত্রে তা অসম্ভব হবে কেন। পাটি পেতে চাকর আলসের ধারে বসিয়ে দিয়ে গেছে হরকিঙ্করকে। এখন ছাদ নির্জন। লক্ষ্মী স্বামীর কোল ঘেঁষে বসল। পরমযত্নে আঁচল দিয়ে লালাটুকু মুছিয়ে দিয়ে ওর লোমহীন অথচ শক্ত বুকে হাত রাখল। সাপের মুখের ওপর মন্ত্রপড়ার মত মুখ করে হরকিঙ্করকে দেখতে লাগল সে। হরকিঙ্কর চুপচাপ চাঁদের দিকে তাকিয়ে। লক্ষ্মী খুব আস্তে উচ্চারণ করল, 'বল, লক্ষ্মী, ল-খ-ঈ। আমার নাম ধরে তুমি ডাক। ল-খ-ঈ।' অবাক চোখে স্ত্রীকে দেখল হরকিঙ্কর। কয়েকবার শোনার পর তার ঠোঁট ফাঁক হল। কিন্তু কিছু লালা আর গোঙানি ছাড়া আর কিছু বেরুলো না তার মুখ থেকে। লক্ষ্মী আবার বলল, 'তোমাকে বলতেই হবে, বল, ল-খ-ঈ। আমাকে তুমি নাম ধরে ডাকবে না? ল-খ-ঈ।'

প্রায় আধঘণ্টা চেষ্টার পর হঠাৎ হরকিঙ্করের জড়ানো গলায় শব্দ উঠল 'ল-ল-ল।' বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত শিহরিত হল লক্ষ্মী, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বল ল-খ-ঈ।' কিন্তু না শত চেষ্টায় আর এক

পা এগোল না হরকিঙ্কর। একসময় 'ল' হারিয়ে গেল গোঙানিতে। সমস্ত মুখ জোড়া লালা মুছিয়ে দিয়ে লক্ষ্মী প্রতিজ্ঞা করল যে করেই হোক স্বামীকে দিয়ে সে তার নাম উচ্চারণ করাবে। একদিনে হবে না কিন্তু প্রতিদিন যদি চেষ্টা করে যায় তবে কি একদিন সে শুনতে পাবে না স্বামীর মুখে নিজের নাম।

পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল সে, মাটি থেকে উঠে পড়ে গঙ্গার দিকে চোখ রাখল। চাঁদের আলোয় গঙ্গার জল চকচক করছে অপূর্ব শীতল বাতাস বয়ে আসছে নদীর শরীর ছুঁয়ে। হঠাৎ সে দেখতে পেল একটা ছিপ-নৌকো নদী পেরিয়ে এপাশে একদম বাড়ির গায়ে লাগছে। নৌকোটায় দ্বিতীয় আরোহী নেই। যে আছে সে মনের আনন্দে চাপা গলায় গাইছে, 'ওমা তোমার মুখের কালি মুছিয়ে দেব নইলে ছেলে হলাম কেন?'

লোকটা কে? অমন চুপিসাড়ে আসছে কেন এ বাড়ির পেছনে? গান গাইছে গলা না খুলে, খারাপ মতলব নেই তো? লক্ষ্মী দেখল ওপাশের ভাঙ্গা পাঁচিলের ওপর লাফিয়ে

উঠে পড়ল লোকটা। তারপর দ্রুত চারপাশে নজর বুলিয়ে নিল।

সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মী পরিবেশ ভুলে চিৎকার করে উঠল, 'অ্যাই, তুমি কে ?'

চমকে উঠল লোকটা, তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে ছাদের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কে ?'

লক্ষ্মীর খুব রাগ হয়ে গেল। ভয়ডর তার নেই। প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে চোরের মত আসা লোকটা তাকেই প্রশ্ন করছে, সাহস কত! সে বলল, 'খুব সাহস দেখছি!' এতক্ষণে লোকটা ধাতস্থ হয়েছে যেন কারণ তার মুখের গম্ভীর রেখাগুলো শক্ত হল, 'কে তুমি ? আগে দেখিনি তো!'

'আমিও তো তোমাকে আগে দেখিনি। দাঁড়াও, সবাইকে আমি ডাকছি!' লক্ষ্মীর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে পেছনে পায়ের আওয়াজ উঠল।

ঘাড় ঘুরিয়ে সে বৃদ্ধ চাকরকে দেখতে পেয়ে কিছু বলতে যাওয়ার আগেই শুনতে পেল, 'কি করছ, মা ঠাকরুণ, উনি তো আমাদের মেজবাবু।'

সঙ্গে সঙ্গে জিভ বেরিয়ে এল, একমাথা ঘোমটা দিয়ে দ্রুত সরে এল সে আলসে থেকে। কাঁপুনি এসে গেছে শরীরে। ভাদ্দরবউ হয়ে সে ভাসুরকে অমন করে বলল! কিন্তু ভাসুর

যদি চোরের মত আসে আর যে ভাসুরকে সে কখনো চোখে দেখেনি তা হলে সে কি করতে পারে। সেকথা চাকরকে বলতেই সে মাথা নীচু করে জানাল, 'মেজবাবু তো দেশের কাজ করেন। তাই যখন এখানে আসেন তখন কাউকে জানাতে চান না। চল, রাত হয়েছে, এবার হিম লেগে যাবে।'

ঠিক তার কয়েক মিনিট পরে তারাসুন্দরীর ঘরে শিবশঙ্কর প্রশ্ন করলেন, 'এই বাড়িতে একটা বাচ্চা মেয়ে এসেছে সে কে?'

অনেকদিন বাদে দেবরকে দেখতে পেয়ে খুশী হলেও তারাসুন্দরী কেমন অসহায় বোধ করছিলেন। প্রশ্নটা শুনে বিস্ময় প্রকাশ করলেন, 'বাচ্চা মেয়ে! ও, তুমি ছোটর কথা বলছ? তাকে দেখলে কোথায়?'

'ছোট? মানে?'

'তুমি তো ডুমুরের ফুল। পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া যায় না। মাঝে মাঝে ধূমকেতুর মত উদয় হও! শ্রাবণে ছোটকর্তার বিয়ে হয়ে গেছে। বড় লক্ষ্মী মেয়ে। নাম দিয়েছি লক্ষ্মী। তুমি ভাসুর হয়ে গেছ, বুঝলে মশাই। নিজে বিয়ে না করতে চাইলে এমন হয়।' তারাসুন্দরী ঠাট্টার গলায় বললেন।

স্তব্ধ হয়ে গেলেন শিবশঙ্কর। তারপর কোনরকমে বলে উঠলেন, 'ছোটর বিয়ে দিলে তোমরা?'

ভীষণ রাগ হয়ে গেল তারাসুন্দরীর। কেন ছোটর বিয়ে

দিতে হল জানেন শিবশঙ্কর। সে যদি রাজী হ'তো তাহলে কি কখনো এমন ঘটনা ঘটতে পারতো? এখন জেনে শুনে ন্যাকামি হচ্ছে! তারাসুন্দরী বললেন, 'আমাদের কোলিয়ারী এখন আগুনে পুড়ছে। এমাস থেকে তার আয় বন্ধ। আগামী কোজাগরীতে যদি দেবীর পুজো না হয় তাহলে আমরা পথে গিয়ে দাঁড়াবো।'

শিবশঙ্কর বউদির দিকে তাকালেন, 'মেয়েটি অবশ্য মুখরা কিন্তু সুন্দরা। এত সৌন্দর্যের কি প্রয়োজন ছিল?'

ব্যাপারটা ভাল লাগল না তারাসুন্দরীর, 'এ বংশের বউ কখনো কুৎসিৎ হয় না।'

'আমি কুৎসিতের কথা বলছি না, বলেছি অত সুন্দর না হলেও চলত। সৌন্দর্য মানুষকে অহঙ্কারী করে, এই যেমন তোমাকে করেছে।' কথাটা লঘু করার চেষ্টা করলেন শিবশঙ্কর।

'আমি অহঙ্কারী?' ফুঁসে উঠলেন তারাসুন্দরী।

সঙ্গে সঙ্গে হাতজোড় করলেন শিবশঙ্কর, 'রক্ষে কর। চামুণ্ডা মূর্তি ধারণ করো না। আচ্ছা, এসো অন্য কথা বলি। আমায় খুঁজতে কেউ এসেছিল এখানে?'

'আমি জানি না।'

'থানা থেকে?'

'ওমা, থানা থেকে আবার কে আসবে?'

শিবশঙ্কর বললেন, 'আমার বোধহয় এভাবে এখানে আসা আর চলবে না, পুলিস পেছনে লেগেছে। একদিন হয়তো খবর পাবে আমি নেই। আমি জানি, আমার জন্যে চোখের জল ফেলার লোক পৃথিবীতে তুমি ছাড়া আর কেউ নেই। কিন্তু তুমি যদি তখন কাঁদো তাহলে আমি খুব কষ্ট পাবো।'

সমস্ত শরীরে কাঁপুনি এল তারাসুন্দরীর। এ বাড়িতে আসার পর কাছাকাছি বয়সের মধ্যে তিনি এই দেবরটিকে পেয়েছিলেন। সম্পর্কটা তাই অনেকটা বন্ধুত্বের। কিন্তু কোনদিন ঠিক বুঝে উঠতে পারেননি এঁকে। তিনি শিবশঙ্করের কথার জবাবে কিছুই বলতে পারলেন না। শিবশঙ্কর হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠলেন। তাঁকে এখনই চলে যেতে হবে। তিনি হাত পাতলেন, 'দাও।'

তারাসুন্দরী চমকে উঠলেন। এই আশঙ্কাটাই দেবরকে দেখার পর তাঁকে কুরে খাচ্ছিল। এতদিন পর্যন্ত যখনই শিবশঙ্কর এসেছে হাত পাতলেই তাঁকে টাকা দিয়েছেন। কিন্তু এখন তো তাঁর অবস্থা প্রায় রিক্ত। কোনরকমে তিনি বললেন, 'কত?'

'যত পার। দশ বিশ হাজার। এক জাহাজ অস্ত্র আসবে ব্যবস্থা করতে পারা গেছে। কিন্তু তার জন্যে টাকা দরকার। আমাদের বাড়িতে লক্ষ্মী বাঁধা আছে সবাই জানে। তাই

দায়িত্বটা আমার ওপর পড়েছে। আমি এখনই ফিরে যাব।' শিবশঙ্কর অধীর হলেন।

'আর একটা মাস অপেক্ষা করা যায় না? কোজাগরী পূর্ণিমা পর্যন্ত!' তারাসুন্দরী মিনতি জানালো। কোজাগরী পূর্ণিমার পর এই বংশ কুবেরের সমান হবে।

'অসম্ভব। জাহাজ রেডি হয়ে আছে। আমরা টাকা পাঠালেই—. কেন তোমার হাতে টাকা নেই?'

'না।'

'সেকি! কেউ একথা বিশ্বাস করবে? যে বাড়িতে লক্ষ্মী বাঁধা আছে সে বাড়িতে টাকা নেই? উঃ, আমি এখন কি করে মুখ দেখাবো?' শিবশঙ্কর দুহাতে মুখ ঢাকলেন।

তারাসুন্দরী মন স্থির করে ফেললেন। দেবরকে অপেক্ষা করতে বলে দ্রুত পায়ে নিজের ঘরে ফিরে গেলেন। নিজের গহনা তো প্রায়ই স্বামীর জন্য বেরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তাঁর শাশুড়ির গহনাগুলো তো গচ্ছিত আছেই সিন্দুকে। তার তিন-ভাগের এক ভাগ শিবশঙ্করের স্ত্রী এলে পেত। কিন্তু যে ছেলে বিয়েই করবে না তখন আর গহনাগুলো তার বউএর জন্য রেখে কি লাভ। কাপড়ের পুঁটুলিতে গহনাগুলো বেঁধে তিনি ফিরে এলেন দেবরের কাছে।

'জানি না এর দাম কত হবে তবে এছাড়া আর কিছু দেওয়ার

নেই !'

শিবশঙ্কর দ্রুত হাতে পুঁটুলিটা নিয়ে সন্দিগ্ধের গলায় প্রশ্ন করলেন, 'কি আছে এতে ?'

'গহনা।'

শিবশঙ্কর নিঃশব্দে কিছুক্ষণ তারাসুন্দরীর দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর ধীরে ধীরে পুঁটুলিটা মাটিতে নামিয়ে রাখলেন। এ বাড়ির পুরুষদের মধ্যে এই ধরনের ভাবপ্রবণতা কখনো লক্ষ করেননি তারাসুন্দরী। তাঁর বাকরুদ্ধ হয়ে গেল। তিনি পাথরের মত দাঁড়িয়ে থেকে দেখলেন শিবশঙ্কর ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। জানলায় দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ বাদে গঙ্গার ওপর ভেসে যাওয়া ছিপনৌকার দিকে তাকিয়ে তাঁর চোখ থেকে বান নেমে এল। এই প্রথম রিক্ত হাতে ফিরে যাচ্ছেন শিবশঙ্কর। জ্যোৎস্নায় তাঁর বলিষ্ঠ দেহটা চকচক করছে। আর একটা মাস, মাত্র একটা মাস অপেক্ষা করা কি নিতান্তই অসম্ভব ছিল !

আজ কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা। রায়বাড়িতে আজ দেবীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে এখবর চুঁচুড়া শহরের কারো জানতে

বাকী নেই। তারাসুন্দরী শেষ সঞ্চয় ব্যয় করেছেন এই আয়োজন সার্থক করতে। সকাল থেকেই ভূগর্ভস্থ সেই কক্ষটির সামনে নানারকম আলপনা ফুলে সাজানো হচ্ছে। তারাসুন্দরী নিজে তদারক করছেন। কক্ষটির দরজা বন্ধ। বগলাচরণ ভট্টাচার্য নিজের হাতে যে তালা বন্ধ করে গিয়েছিলেন সে তালা এখনও তেমনি রয়েছে। লক্ষ্মীকে আজ আর হরকিঙ্করের কাছে যেতে দেননি তারাসুন্দরী। সারাদিন উপোস করে পবিত্র মনে থাকতে হবে তাকে। হোক সে বিকলাঙ্গ তবু তো স্বামী, প্রকৃত পুরুষ নাইবা হল। ফলে মেজাজ চড়ে গেছে হরকিঙ্করের। প্রত্যহের মত সকাল থেকে স্ত্রীকে সে আজ দ্যাখেনি। মাঝে মাঝেই তার প্রতিবাদের চিৎকার এ বাড়ির সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। বৃদ্ধ চাকরের পক্ষে সেটা বন্ধ করা অসম্ভব হয়ে উঠছে। চিৎকার কানে যাচ্ছে লক্ষ্মীরও। স্বামীকে প্রবোধ দিয়ে ভুলিয়ে রাখতে সে ছটফট করলেও কোন উপায় নেই। আজকের দিনটা যদি সে কঠোরও হয় তবে তা আজকের দিনই মাত্র। দেবী প্রসন্ন হলে স্বামী সুস্থ হয়ে উঠবেন সারা জীবনের জন্য। এজন্য এটুকু কষ্ট তাকে সহ্য করতেই হবে।

ব্যতিক্রম হয়েছে রামকিঙ্করেরও। রোজ দ্বিপ্রহরে তিনি ঘুম থেকে ওঠেন। কিন্তু আজ যে কেন প্রত্যুষেই নিদ্রাদেবী তাঁকে ছেড়ে গেল কে জানে। তারপর চেষ্টা করেও বিছানায়

থাকা গেল না। সকালবেলার চেহারা অনেকদিন পর দেখলেন তিনি। গঙ্গার নির্মল বাতাসে তাঁর মনে হল, বাঃ, এসময় পৃথিবীটা তো অন্যরকম থাকে। আজ দেবীর প্রতিষ্ঠা হবে এই গৃহে। রামকিঙ্কর মনস্থির করলেন আজ তিনি সম্পূর্ণ বিপরীত জীবন যাপন করবেন। আজ আর কোন ব্যসন নয়। সারাদিন দেবীর প্রশস্তি গাইবেন গানে গানে। স্নান করে বাইবের ঘরে এসে বসতেই সর্বত্র খবরটা ছড়িয়ে পড়ল। বড়বাবু আজ ঘুম ছেড়ে উঠেছেন—সেটা দেবীরই মাহাত্ম্য। খবরটা তারাসুন্দরীর কানে যেতেই তিনি শিহরিত হলেন। হাতজোড় করে দেবীকে প্রণাম জানালেন তিনি। মানুষটা যদি এমনি করে বদলে যায় দেবীর ইচ্ছায় তাহলে, তাহলে! হঠাৎ একটা আশা বুকের মধ্যে একটু একটু করে মুখ তুলল তাঁর। এমন কিছু বয়স হয়নি, দেবী যদি প্রসন্ন হন তাহলে তিনি তারা-সুন্দরীকে মা হবার সম্মান দিতে পারেন। রামকিঙ্করের এই পবিবর্তন কি তারই প্রথম ইংগিত নয়? একা একা দাঁড়িয়ে তারাসুন্দরী শিহরিত হতে লাগলেন।

রামকিঙ্কর বাইরের ঘরে বসে আছেন। আজ তাঁর মন মেজাজ খুবই ভাল। পিতৃপিতামহের একমাত্র বাসনা আজ পূর্ণ হতে চলেছে। আজ পূজা শেষে কালীকিঙ্কর রায়ের আত্মা মুক্তি পেয়ে সাধনলোকে চলে যাবে। এই বংশকে পূর্ণ সাফল্যের

ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়ে তিনি ছুটি নেবেন। এতদিন ধরে ওই মাটির নীচের ঘরে তিনি দেবীর সঙ্গে বন্দী ছিলেন। দেবী যদি তৃপ্ত হন তবে তাঁর আত্মার আর থাকার প্রয়োজন নেই। যেহেতু আত্মা চোখে দেখা যায় না তাই রামকিঙ্কর পূর্বপুরুষকে সেই মুহূর্তে দেখতে পাবেন না। কিন্তু যেই ভোর হবে, আলো ফুটবে আকাশে তখন থেকেই দেবীর মহিমা বোঝা যাবে। কুবেরের সমকক্ষ হবেন তাঁরা। তাঁর কিছু ঋণ হয়ে গেছে একথা ঠিক। কিন্তু কাল সকালের পর আর সে চিন্তা করার মানে হয় না। সঙ্গে সঙ্গে একটা আশঙ্কা তাঁর মনে জন্ম নিল। যদি আজ রাত্রে পূজা আরম্ভের আগেই ছোটবউ ঋতুমতী হন। খুব অস্বস্তি শুরু হল তাঁর। তাহলে তো সবই ভেস্তে যাবে, অন্ধকার নেমে আসবে। একজন চাকরকে তিনি পাঠালেন তারাসুন্দরীর উদ্দেশ্যে। একবার নিজের মুখে শোনা দরকার।

তারাসুন্দরী এলেন সচরাচর বাইরের এই ঘরে তিনি প্রবেশ করেন না। আজও দরজার বাইরে একমাথা ঘোমটা দিয়ে তিনি দাঁড়ালেন। ঘরে আর কেউ নেই। রামকিঙ্কর আসন থেকে উঠে পত্নীর মুখোমুখী দাঁড়াতেই প্রশ্ন শুনলেন, 'আপনার শরীর ভাল তো?'

'শরীর! শরীর অসুস্থ হবে কেন?' অবাক হলেন রামকিঙ্কর! তারপরই হো হো করে হেসে উঠে বললে, 'ও,

সকালে উঠেছি বলে বলছ? তা আজ দেবীর প্রতিষ্ঠা হবে আমি কি বিছানায় পড়ে থাকতে পারি? আমি ভাল আছি। ওদিকের সব আয়োজন প্রস্তুত?'

তারাসুন্দরীর মুখ দেখা যাচ্ছিল না, 'হ্যাঁ।'

এবার রামকিঙ্কর তাঁর শঙ্কা ব্যক্ত করলেন, 'বউমার শরীর—।'

তারাসুন্দরী দ্রুত ঘাড় নাড়লেন, 'মায়ের ইচ্ছায় ঠিকই আছে। ঠিক থাকবে।'

'আঃ, বাঁচালে! যাও, তোমায় আর আটকে রাখব না।' প্রফুল্ল মনে কথাগুলো বললেন রামকিঙ্কর। একটা ভার বুকের ওপর থেকে নেমে গেল।

তারাসুন্দরী চলে যাচ্ছিলেন এমন সময় রামকিঙ্কর আবার তাকে ডাকলেন, একটা কথা কদিন থেকেই ভাবছি। মেজ তো বিয়ে করল না। ছোটর যা অবস্থা তা সবাই জানে। আমরাও কিছু পারলাম না। রায়বংশ কি এখানেই শেষ হয়ে যাবে? তবে দেবীর প্রতিষ্ঠা করে লাভ কি যদি ফল ভোগ করার কেউ না থাকে'

তারাসুন্দরী কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তবে কি স্বামী এবার পুনর্বিবাহের কথা চিন্তা করছেন। শেষ পর্যন্ত সতীন আসবে এ বাড়িতে। তাই হোক, তিনি সব মেনে নেবেন। পরক্ষণেই ভেতরে ভেতরে একটা নাড়া খেলেন তারাসুন্দরী। খুব

ধীরে অথচ স্পষ্ট গলায় উচ্চারণ করলেন, 'যাঁর স্পর্শে অন্ধ চোখ ফিরে পায়, কুষ্ঠরোগী রোগমুক্ত হয়, তিনি যদি আজ রাত্রে তুষ্ট হন তাহলে তিনিই রায়বংশের দায়িত্ব নেবেন। আমরা যদি এ ব্যাপারে চিন্তা করি তবে তা হবে তাঁকেই অবিশ্বাস করা।'

রামকিঙ্কর বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হলেন, 'তার মানে তুমি বলছ আমরা এবার সত্যিই—।'

তারাসুন্দরী বললেন, 'এছাড়া দেবীর কাছে আমার কিছু চাওয়ার নেই!' কথা শেষ করে দাঁড়ালেন না তারাসুন্দরী। স্বামীর দৃষ্টির সামনে দাঁড়াতে এতদিন পরে তাঁর অল্পবয়সী লজ্জাটা ফিরে এল।

খুব হালকা লাগছে এখন রামকিঙ্করের। মুহূর্তেই মন উদার হয়ে গেল। এই মুহূর্তে কেউ যদি তাকে তাঁর সর্বস্ব দিয়ে দিতে বলত তিনি তাই দিয়ে দিতেন। স্থান কাল ভুলে তাঁর কণ্ঠ থেকে সুর বেরিয়ে এল। মল্লার। গুণগুণ করে গাইতে গাইতে বিরাট ঘরটা পায়চারি করতে লাগলেন তিনি। লক্ষ করেননি সরকার মশাই দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন। এটা গানের ঘর নয়, অতএব সরকার মশাই মৃদু কেসে নিজের উপস্থিতি জানালেন। রামকিঙ্কর ঘুরে দাঁড়িয়ে সরকার মশাইকে দেখে বলে উঠলেন, 'কি সংবাদ?'

সরকার মশাই কিছুটা ইতস্তত করে জানালেন, 'উত্তরপাড়ার

বলাইচাঁদ মল্লিক দেখা করতে এসেছেন।'

অবাক হলেন রামকিঙ্কর। এসময় স্বয়ং ঈশ্বর এলেও তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না একথা কারো অজানা নয়। তাহলে বলাইচাঁদ কি বুদ্ধিতে আসে!

সরকার মশাই মাথা নীচু করেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি বলব?'

'নিয়ে আসুন।' রামকিঙ্করের অনুমতি পেয়ে সরকারমশাই বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু তাঁর হাবভাবে বোঝা যাচ্ছিল আজ যদি রামকিঙ্কর দেখা না করতেন তাহলে তিনি খুশীই হতেন।

রামকিঙ্কর চেয়ারে এসে বসলেন। বিরাট হাতলওয়ালা লম্বা চেয়ার নীচে পা রাখার জন্য চৌকো বাক্স চেয়ারের সঙ্গে লাগানো আছে। পাশেই কালো কাঠের চকচকে একটা অর্ধ-চন্দ্রাকার টেবিল। টেবিলের পাশেই তিনটে সাধারণ চেয়ার। বলাইচাঁদের রপ্তানীর ব্যবসা আছে। প্রচুর অর্থবান মানুষ।

সরকারমশাই তাঁকে পৌছে দিয়ে বিদায় নিলেন। বেঁটে খাটো রোগা মানুষটির বয়স পঞ্চাশ ছুঁয়েছে। গায়ের রং ফেটে পড়ছে এই বয়সেও। পোশাকে একটুও আড়ম্বর নেই, হাতে ছোট্ট লাঠি। ঘরে ঢুকেই নমস্কার জানালেন বলাইচাঁদ। তারপর ধীর পায়ে সামনে এসে দাঁড়ালেন। রামকিঙ্কর নমস্কারের উত্তরে সামান্য মাথা নেড়ে একটি চেয়ার দেখিয়ে দিলেন। বলাইচাঁদ

আসন গ্রহণ করে কথা শুরু করলেন 'এসময় আসবার ইচ্ছে আমার একদম ছিল না। পরে ভাবলাম আজ আপনাদের বংশের উল্লেখযোগ্য দিন। তাই হয়তো নিয়মের ব্যতিক্রম হতে পারে। দেখলাম আমার অনুমান মিথ্যে নয়।'

রামকিঙ্কর হাসলেন, 'হ্যাঁ, আজ সত্যি অন্যদিন। বলুন কি আনতে বলব ? সরবৎ ?'

দ্রুত ঘাড় নাড়লেন বলাইচাঁদ, 'না, না, ওসব চিন্তা করবেন না। যে জন্য আমাকে আসতে হল তাই বলি। মিছিমিছি সময় নষ্ট করা আমার অভ্যেস নয় আপনি জানেন। আমার একমাত্র কন্যার বিবাহ হঠাৎই স্থির হয়ে গেল। আগামী মঙ্গলবার পাকা দেখা। বিবাহ অগ্রহায়ণে হলেও ওইদিনই পাত্রকে আশীর্বাদ করে বরপণ দিতে হবে। কিন্তু বিদেশে আমার প্রচুর অর্থ আটকে আছে। এই অবস্থায় আপনি যদি আমাকে আপনাকে দেওয়া টাকাটা ফেরত দেন তাহলে উপকৃত হই।'

অভ্যাস মানুষকে সর্বদা নিয়ন্ত্রণ করে। জন্মাবধি রামকিঙ্কর কখনই পাওনাদারের তাগাদায় অভ্যস্ত নন। কথাটা শুনেই তাঁর মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। হ্যাঁ, বলাইচাঁদ তাঁর কাছে এক লক্ষ টাকা পাবেন। এই ঋণ সরকার মশাই-এর মাধ্যমে তিনি গ্রহণ করেননি। শোধ দেওয়ার যে সময়সীমা ছিল তা অতিক্রান্ত হয়নি। তাহলে কি সাহসে তিনি তাগাদা দিতে

আসেন ? রামকিঙ্কর স্থির দৃষ্টিতে বলাইচাঁদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

বলাইচাঁদ সেটা লক্ষ্য করে বলে উঠলেন, 'আমি জানি এক লক্ষ টাকা আপনার কাছে হাতের ময়লা মাত্র। যাঁর বাড়িতে লক্ষ্মী বাঁধা আছেন তিনি ইচ্ছে করলেই এ টাকাটা দিয়ে দিতে পারেন।'

'না দিতে পারি না।' রামকিঙ্কর চিৎকার করে উঠলেন।

'সেকি ! টাকাটা যে আমার দরকার, আজই।' আঁতকে উঠলেন বলাইচাঁদ !

'কিন্তু আমি এখন দিতে অক্ষম।'

'অক্ষম ! যার বাড়ীতে লক্ষ্মী বাঁধা তিনি অক্ষম ? আপনি কি আমার সঙ্গে রসিকতা করছেন ? আপনার প্রয়োজনে আমি এক কথায় টাকা দিয়েছি কারণ আপনাকে টাকা দেওয়া মানে ব্যাঙ্কে টাকা রাখা।'

'আপনাকে যেদিন ফিরিয়ে দেব বলেছি তার একদিন আগেও আপনি পাবেন না। যারা টাকা দিয়ে তাগাদা দেয় ফেরত পাবার জন্য তাদের সঙ্গে আর কথা বলতে চাই না।'

রামকিঙ্কর উঠে দাঁড়াতেই ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন বলাইচাঁদ, 'কি, আমাকে অপমান ! দেব হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে।'

'কি হাঁড়ি ভাঙ্গবেন মল্লিকমশাই ?' ঘুরে দাঁড়ালেন রামকিঙ্কর।

'আমি খবর রাখি না ভেবেছেন। ওই বুড়ো সরকার যে রোজ গাদা গাদা সোনার গহনা লক্ষ্মীবাবুর দোকানে নিয়ে যায় বিক্রী করতে সেটা আমার অজানা ? ওসব লক্ষ্মীটক্ষী সব ভাঁওতা। কুঁজোর জল গড়িয়ে তলানিতে এসেছে। টাকা দিতে না পারেন গহনাই দিন। নইলে যখন টাকা দেওয়ার সময় আসবে তখন একটা ইটও পাব না।' বলাইচাঁদ ঠকঠক করে কাঁপছিলেন।

রামকিঙ্কর গম্ভীর মুখে কথাগুলো শুনলেন। তারাসুন্দরী তাহলে গহনা বিক্রী করছেন তাঁকে না জানিয়ে। কিন্তু এই মূর্খটাকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া দরকার। তাঁর বিশাল রক্তবর্ণ চোখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলাইচাদ কেঁপে উঠলেন। তাঁর মনে পড়ল এঁরা শাক্ত, শক্তদের অসাধ্য কিছু নেই।

রামকিঙ্কর বজ্রকণ্ঠে বললেন, 'এই বাড়ি থেকে এরপর চলে যাওয়ার আশা আপনি নিশ্চয়ই করেন না মল্লিকমশাই। আমার বাড়ির পাশেই গঙ্গা। সেখানে কাউকে ছুঁড়ে দিলে পুলিসও টের পাবে না। আমার বাড়ির প্রতিষ্ঠিত দেবীর অস্তিত্বে যে সন্দেহ করে তাকে তো ফিরতে দিতে পারি না।'

বলাইচাদের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। কোনরকমে বললেন, 'তার মানে ?'

রামকিঙ্করের বক্ত এখন স্থির, 'মানে বুঝতে কি খুব অসুবিধে হচ্ছে ! আপনি এত কথা জানেন আর এটা জানেন না যে

আমরা শাক্তমতে লক্ষ্মীপূজো করি!'

প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন বলাইচাঁদ। নেহাৎ ঝোঁকের মাথায় চলে এসেছিলেন তিনি। আসবার সময় কাউকে জানিয়ে আসেননি যে এ বাড়িতে আসছেন। রামকিঙ্কর যা বলছেন তাই যদি করেন তবে কেউ তাঁর খোঁজ পাবে না। এই মানুষটির দিকে তাকিয়ে তাঁর মনে হল মেরে ফেলা এঁর কাছে কোন সমস্যাই নয়। ভেঙ্গে পড়লেন বলাইচাঁদ। প্রায় প্রাণভিক্ষা চাওয়ার ভঙ্গীতে আকুতি মিনতি করতে লাগলেন তিনি।

রামকিঙ্কর হঠাৎ অন্যমানুষ হয়ে গেলেন। এই লোকটার কত প্রতাপ আর আজ এই মুহূর্তে ওর চেহারা কি রকম দেখাচ্ছে! মানুষ নিজের প্রাণকে এত ভালবাসে? আজকের রাতটা কেটে গেলে তিনি হবেন কুবেরের সমকক্ষ। তখন এই লোকটার মুখের ওপর সবটাকা ছুঁড়ে দিতে একটুও চিন্তা করতে হবে না তাঁকে। কিন্তু এই মুহূর্তে তাঁর পক্ষে একশ টাকা দেওয়া অসম্ভব। একবার ভাবলেন কাল সকাল পর্যন্ত লোকটাকে আটকে রাখা যাক। পরক্ষণে মন পরিবর্তন করলেন, 'মল্লিক মশাই, আপনার অনেক ভাগ্য যে আজ দেবীর প্রাণ-প্রতিষ্ঠার দিন। আমরা শাক্ত হলেও আপনাব ভয় নেই। আপনি স্বচ্ছন্দে যেতে পারেন। তবে যাওয়ার আগে নিজের পাদুকা খুলে খালি পায়ে হেঁটে যান। দেবীকে সন্দেহ করার জন্য আজ থেকে আপনার

অশৌচ শুরু হল। আপনার টাকা আপনি মঙ্গলবারের মধ্যেই পেয়ে যাবেন। যান।'

কিন্তু যতই বেলা বাড়তে লাগল ততই জ্বলুনি বৃদ্ধি পেল রামকিঙ্করের। আজ দেবীর পুজো তবু তাঁকে অপমান সহ্য করতে হল! এইদিনে পাওনাদার প্রথম তাঁকে বিব্রত করতে এল। তাহলে দেবীর কি প্রসন্নতা আসেনি? না, আজকের রাতটা দেখা দরকার। এছাড়া তিনি কিইবা করতে পারেন। তান্ত্রিক বগলাচরণের সেই ভবিষ্যদ্বাণী কি ব্যর্থ হবে? বলাইচাঁদের কথা যতই চিন্তা করছিলেন ততই তাঁর সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। এসব কথা আর কেউ জানে না শুধু সরকারমশাই ছাড়া। কিন্তু তার সঙ্গে রামকিঙ্কর পরে এ ব্যাপারে একটি কথাও আলোচনা করেননি। বলাইচাঁদকে ছেড়ে দেওয়া বোধহয় ঠিক হল না। বাইরে বেরিয়ে সে শহরময় বলে বেড়াবে রায়েদের টাকা নেই, লক্ষ্মীর ব্যাপারটা ভাঁওতা। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, না, মঙ্গলবার অবধি লোকটা মুখ বন্ধ করে থাকবে নিশ্চয়ই। কারণ তার আগে কিছু বললে সে যে আর টাকা পাবে না একথা তার

চেয়ে বেশী কেউ জানে না। মামলা করে কদিনে আদায় করা যায়? অত বড় মূর্খ বলাইচাঁদ নয়। মনটাকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন রামকিঙ্কর।

রামকিঙ্কর স্থির করেছিলেন আজ বিধবার জীবন যাপন করবেন। অর্থাৎ মদ্যপান করবেন না এবং আতরবালার ঘরে যাবেন না, বাড়িতেই থাকবেন। গতরাত্রে আসার সময় আতরকে বলে এসেছিলেন, 'কাল তোমার ছুটি। পরশু আবার আসব চাঁদমুখ দেখতে।' এখন বিকেল। একটু পরেই সন্ধ্যে নামবে কিন্তু অন্ধকার থাকবে না। কারণ আজ কোজাগরী পূর্ণিমা। আকাশে চাঁদ উঠবে।

কিন্তু সব অন্যরকম হয়ে গেল। রামকিঙ্করের এক অনুচর এসে চুপিসাড়ে খবর দিয়ে গেল বেলঘোরের শ্রীদাম দত্ত আজ নাকি আতরের ঘরে যাচ্ছে। বহুদিন ধরে আতরের ওপর নজর লোকটার। রামকিঙ্করের জন্য এতদিন সে আতরের ঘরে ঢুকতে পায়নি। আজ যে রামকিঙ্কর যাচ্ছেন না সে খবর পেয়ে গেছে সে। আতরকে জানিয়েছে মাঝরাত্রে সে আসবে।

মাঝরাত কেন? না, পূজা শেষ করে তিনি বিহারে যাবেন। মাথায় খুন চেপে গেল রামকিঙ্করের। আতরবালা তাঁর বাঁধা মেয়েছেলে। ওপাড়ার নিয়ম হল কেউ কোন

বাবুর কাছে বাঁধা থাকলে অন্য কাউকে ঘরে বসাতে পারে না। আতর তাহলে কি করে শ্রীদাম দত্তকে ঘরে ঢোকাবে? মুহূর্তে মন প্রস্তুত করে ফেললেন তিনি। নিত্যকার পোশাক উঠল অঙ্গে। আতরের সঙ্গে কথা বলে মাঝ রাতের আগেই বাড়ি ফিরে আসবেন তিনি। একবার আতরের সামনে দাঁড়ালে সে আর সাহস পাবে না শ্রীদাম দত্তকে ঘরে ঢোকাতে। নিত্যকার অভ্যাসে তারাসুন্দরীর ঘরের দিকে এগোতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন রামকিঙ্কর।

আজ নিশ্চয়ই তারাসুন্দরী এইসময় নিজের ঘরে রামকিঙ্করের প্রতীক্ষায় নেই। এই কোজাগরী পূর্ণিমার রাতে তিনি গিয়ে দাঁড়াবেন এটা কল্পনা করতে পারেন না তারাসুন্দরী। তাঁকে ডেকে এনে হাত পাততে সঙ্কোচ হল রামকিঙ্করের। জীবনে এই প্রথমবার তাঁর মনে হল স্ত্রীর কাছ থেকে তিনি শুধু নিয়েই গেছেন বিনিময়ে কিছুই দেওয়া হল না। আজ এই বিশেষ রাতে স্ত্রীকে বিব্রত না করে রামকিঙ্কর ধীরে ধীরে নীচে নেমে এলেন। দরজায় সরকারমশাই দাঁড়িয়েছিলেন। বড়কর্তাকে প্রতিদিনের পোশাকে বের হতে দেখে চমকে উঠলেন তিনি যেটা রামকিঙ্করের চোখ এড়াল না। কোনদিন কাউকে জবাবদিহি দেবার অভ্যেস নেই। তবু রামকিঙ্কর নিজেই বললেন, 'প্রয়োজনে বের হচ্ছি, প্রয়োজন শেষ হলেই ফিরব। এদিকে পূজার যেন কোন ব্যাঘাত না হয়

লক্ষ্য রাখবেন।' এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে ভাবলেন সরকার-মশাই-এর কাছে টাকা চাইবেন কিনা! কিন্তু আত্মসম্মান মাথা তুলে দাঁড়াল। না, তারাসুন্দরী ছাড়া এ বাড়িতে কারো কাছে তিনি হাত পাতবেন না। তিনি তো এখনও পথের ভিখিরী হয়ে যাননি। এখনও তাঁর অঙ্গে কয়েক হাজার টাকার সোনা এবং পাথর আছে। কোলকাতা শহরে এগুলো কিনবার লোকের অভাব নেই। ঘোড়াগাড়ির আসনে শরীর এলিয়ে দিয়ে রামকিঙ্কর হাসলেন, আজকের রাতটাই তো শুধু কাল থেকে তাঁরা কুবের।

বন্ধ দরজার সামনে ঘট স্থাপন করে পূজার ব্যবস্থা হয়েছিল। বিবিধ সামগ্রীতে জায়গাটা পূর্ণ। তারকেশ্বর থেকে বিখ্যাত তন্ত্রসাধক এক ব্রাহ্মণ এসেছেন পুজোর তদারক করতে। পাখীপড়া করিয়ে তারাসুন্দরী লক্ষ্মীকে আনলেন পূজার আসরে। বিয়ের সময় যা হয়নি আজ লক্ষ্মীর সেই দশা। তার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে মুখে বাক্‌স্ফুরণ হচ্ছে না। তারাসুন্দরী তাকে বুঝিয়েছেন আজকের রাতটা তার রাত। পবিত্র মনে

পরম নিষ্ঠায় যদি সে দেবীকে আরাধনা করে তাহলে এই বংশের সোনার দিন আসবে। হরকিঙ্কর সুস্থ হয়ে উঠে দাঁড়াবে। কথাগুলো শুনতে শুনতে ক্রমশ লক্ষ্মী বদলে গেল একটু একটু করে। এখন লাল বেনারসী শাড়িতে তাকে দেখলে বুকের মধ্যে থম ধরে যায়। শরীরের সৌন্দর্য চূড়ায় গিয়ে ঠেকলেও তার ওপর চাঁদের আলোর মত এক ধরনের স্নিগ্ধতা পড়ায় মন ভরাট হয়ে যায় তাকে দেখলে।

পুরোহিতের পাশে বসে তাঁর নির্দেশে পূজা শুরু করল সে।

বন্ধঘরের সামনে এই চাতালে বাইরের বাতাস সামান্যই আসে। সিঁড়ির প্রতিটি ধাপে বাড়ির লোকজন করজোড়ে বসে পূজা দেখছে। চাতালের এককোণে বিরাট চেয়ারে বাবু হয়ে ঠেস দিয়ে বসে আছে হরকিঙ্কর। তারাসুন্দরী তাকে নিয়ে এসেছেন এখানে। লক্ষ্মীকে দেখে তার চোখ আর সরে না। চাকরবাকররা এই নিয়ে চোখ টেপাটেপি করছে আড়ালে। ছোট কর্তার চোখ ছোট বউএর মুখে আঠার মত সেঁটে গেছে, কিছুতেই সরছে না সেখান থেকে। বিশেষ দিন বলে ছোটকর্তার পরণে সিল্কের পাঞ্জাবি আর ধুতি। মুখ বন্ধ থাকায় তাকে শাপভ্রষ্ট দেবতার মত মনে হচ্ছে।

পূজার কাজে সাহায্য করছেন তারাসুন্দরী। এটা ওটা জিনিস এগিয়ে দিচ্ছেন পুরোহিতের নির্দেশে ছোট বউএর হাতে।

ছোট বউএর সে চাঞ্চল্য চপলতা এখন আর নেই। নিষ্ঠার প্রাবল্য মানুষের চেহারাও বদলে দেয়। কিন্তু প্রায়ই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছেন তারাসুন্দরী। একটু আগে খবর পেয়েছেন বড়কর্তার ঘোড়ার গাড়ি রওনা হয়ে গিয়েছে। আজ সকাল থেকে যে আশাটা একটু একটু করে আকাশ স্পর্শ করছিল মুহূর্তেই সেটা ভেঙ্গে পড়ল। পাথরের মত দাঁড়িয়ে ছিলেন খবরটা শুনে। যাওয়ার আগে যদি কানে যেত তাহলে যে করেই হোক আজ স্বামীকে বাধা দিতেন তিনি। সরকারমশাই স্বতপ্রবৃত্ত হয়ে জানিয়ে গেছেন বড়কর্তা বিশেষ প্রয়োজনে বেরিয়েছেন। কি প্রয়োজন থাকতে পারে আজ রাতে? তারাসুন্দরী নিজেকে প্রবোধ দিয়েছিলেন, না, রোজকার মত সেই জায়গায় নিশ্চয়ই তিনি যাননি কারণ গেলে অবশ্যই একবার তাঁর সামনে এসে হাত বাড়িয়ে বলতেন, 'দাও'।

মধ্যরাতে পূজা শেষ হল। পুরোহিতের নির্দেশে লক্ষ্মী সবাইকে অঞ্জলি দেওয়ালো। অন্যান্য কাজ সারতে চাঁদ মাথা ডিঙ্গিয়ে চলে গেল। তারাসুন্দরী পুরোহিত বিদায় করতেই মনে হল একটা শীতল বাতাস সিঁড়ি দিয়ে নীচে এল। কণ্টকিত হলেন তারাসুন্দরী। তবে কি এতোদিন পর কালীকিঙ্করের আত্মা মুক্তি পেয়ে চলে যাচ্ছেন! তান্ত্রিক পুরোহিত সেই মুহূর্তে মা মা বলে ডেকে উঠতেই চারপাশ গমগম করে উঠল।

ওপরের ঘরে পাঁচালি পাঠ হবে। কারণ এখানে এমন কিছু জায়গা নেই যাতে পাড়া প্রতিবেশী মহিলারা বসতে পারেন। আজকের রাত জাগার রাত, কে জানে? না, যিনি প্রকৃত ভক্ত যিনি নিবেদিত প্রাণ তিনি জাগবেন। তারাসুন্দরী লক্ষ্মীকে বললেন, 'ছোটবউ, আজ রাতে কিন্তু ঘুমিয়ে পড়িস না। দেবী আজ প্রতি ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়ান। যে ঘুমায় তার কাছে যান না। তা আমাদের সে ভয় নেই। দেবী তো আমাদের ঘরেই রয়েছেন। তবু আজ তোকে জেগে থাকতে হবে।'

ঘাড় নাড়ল লক্ষ্মী। জবুথবু হয়ে সে পূজার সামগ্রীর মধ্যে বসে আছে। এখান থেকে আজ রাত্রে সে নড়বে না। নিজের হাতে তাকে সরবৎ খাইয়ে দিলেন তারাসুন্দরী। মুশকিল হয়েছে আর একজনকে নিয়ে। শতচেষ্টায় ছোটকর্তাকে নড়ানো গেল না। প্রবল প্রতিবাদে সে হাত পা ছুঁড়ল, গোঁ গোঁ করল। ছোটবউ এ ঘর থেকে না গেলে সে যাবে না। শেষ পর্যন্ত তারাসুন্দরী হাল ছেড়ে দিলেন, 'থাক তাহলে। বউএর সঙ্গে ওখানে বসে রাত জাগুক।'

তারাসুন্দরী ওপরের ব্যবস্থা করতে যাওয়ার পর হঠাৎই চাতালটা একদম নির্জন হয়ে গেল। লক্ষ্মীর শিরদাঁড়া টনটন করছে এতক্ষণ একভাবে বসে থাকতে থাকতে। এখানে কেউ নেই দেখে সে সন্তর্পণে উঠে দাঁড়াল শরীরটাকে ঠিক করে নিতে।

এই ভারী শাড়ি জামায় মাথায় ঘোমটা দিয়ে এই শীত-আসা মধ্যরাতেও তার ঘাম দিচ্ছে। সে মুখ ঘুরিয়ে স্বামীর দিকে তাকাল। পূজা শুরুর পর সে ইচ্ছে করেও একবারও স্বামীকে দ্যাখেনি। এমনকি একটু আগে যখন সবাই তাকে ভেতরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল তখনও দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে রেখেছিল। এখন চোখাচোখি হতেই লক্ষ্মী ঠোঁট ওল্টালো। না, কোন প্রতিক্রিয়া নেই হরকিঙ্করের মুখে। এক দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে আছে স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে। অন্য সময় এমন করলে সে হাসে গোঁ গোঁ করে। কিন্তু এখন ও কি দেখছে অমন মুগ্ধ চোখে। লক্ষ্মী এবার জিভ বের করে ভেংচি কাটলো। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল আজকের রাতে এসব করা ঠিক হচ্ছে না। সামনের বন্ধ দরজার ওপাশে দেবী বন্দী রয়েছেন। তিনি যদি এতে অসন্তুষ্ট হন তাহলে —। সে মনে মনে তিনবার বলল, রাগ করো না মা, বলে প্রণাম করল দরজার দিকে তাকিয়ে। স্বামীর সঙ্গে এরকম ব্যবহার করে ভীষণ অন্যায় হয়ে গেছে--এই বোধ তাকে আচ্ছন্ন করল। সে চুপচাপ দরজার দিকে তাকিয়ে বসে থাকল। হঠাৎ ওর মনে হল ওই বন্ধ ঘরে এতদিন দেবী কি করে রয়েছেন? এই একটা রাত এভাবে বসে থাকতেই তার কত কষ্ট হচ্ছে অথচ দেবী তো মানুষের মুখও দেখতে পাচ্ছেন না। ওই ঘরে গেলে দেবীর সঙ্গে কথা বলা যায়, তাকে দুচোখ ভরে দেখা যায়।

কথাটা ভাবতেই রোমাঞ্চ জাগল তার। কিন্তু দরজায় বিরাট তালা ঝুলছে। এতবড় তালা যে দেবীও খুলে বেরিয়ে যেতে পারেননি। ভাগ্যিস পারেননি।

রায়বাড়ির কোন নির্জন কক্ষে যখন কথকের গলায় লক্ষ্মীর পাঁচালির সুর ছাড়া আর কোন শব্দ ছিল না, রায়বাড়ির সর্বাংশ যখন ঘুমে আচ্ছন্ন ঠিক তখন পাশের গঙ্গায় চাঁদের আলোয় তিনটি ছিপ নৌকাকে দ্রুত এগিয়ে আসতে দেখা গেল। নৌকাগুলো এত দ্রুত এগিয়ে আসছিল যে মনে হচ্ছিল তারা যেন চাঁদের শরীর থেকে সরাসরি নেমে আসছে। তিনটে ছিপনৌকায় আরোহীর সংখ্যা ছয়জন। তারা কেউ কথা বলছিল না, যন্ত্রের মত নৌকাগুলিকে দ্রুত হাতে রায়বাড়ির পাশ ঘেঁষে গঙ্গার ওপর স্থির করে দাঁড় করাল। ছজনই দীর্ঘদেহের অধিকারী পেশীবহুল স্বাস্থ্যে জ্যোছনা চকচক করছে। মাথায় লাল পট্টি বাঁধা। ভাল করে লক্ষ্য করলে নৌকায় যে সব অস্ত্রশস্ত্র দেখা যাবে সেগুলোর দিকে তাকালেই বোঝা যাবে কিছুক্ষণ আগেই তা ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রথম নৌকা থেকে একটি মানুষ নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল। চারপাশে নজর বুলিয়ে সে যেন কিছু জরিপ করে নিচ্ছিল। এই শব্দহীন নদীকূলে শুধু জলের নড়াচড়া ছাড়া আর যে শব্দটি ভেসে আসছে তাতে তার কপালে উৎকণ্ঠার ভাঁজ পড়ল। কান পেতে সে শব্দগুলো শুনল—

গৃহমধ্যে ধূপধুনা আর ঘৃতবাতি।
হৃদয় কমলে ওমা করহ বসতি॥
পদ্মাসনা পদ্মদল রাখি থর থরে।
শঙ্খবাদ্যে বরণ করি তোমা ঘরে॥

খানিকটা শোনার পরে তার ঠোঁটে রহস্যময় হাসি ফুটে উঠল। সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'রায়েরা আজ পাঁচালি পড়ছে যে বড়, ব্যাপারখানা কি?'

নৌকার আর এক আরোহী জানাল, 'আজ তো শুনি দেবীর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হবে এখানে।'

প্রথম ব্যক্তি সামান্য ঘাড় নেড়ে নৌকা থেকে একটা বড় পুঁটুলি এক হাতে তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে জলে নেমে পড়ল। অন্য নৌকাগুলো অত্যন্ত সতর্ক হয়ে তার যাওয়া দেখল। নামবার পর দেখা গেল প্রথম ব্যক্তির কোমরের সঙ্গে মোটা সুতো বাঁধা, সে যখন জলের তলায় ডুবে গেল তখন নৌকার ওপর বসা তার সঙ্গীর হাতে সুতোর শেষপ্রান্ত লাট্টুর মত ঘুরে খুলে যাচ্ছে।

প্রথম লোকটির হাবভাব দেখলেই বোঝা যায় সে এই দলের নেতা। জলের তলায় ডুব দিয়ে সে অনেকটা নীচে এল। ওপরে কোন বিপদ বুঝলে সঙ্গী সতর্ক করে দেবে তাই ওই সুতোর ব্যবস্থা। রায়বাড়ির পাঁচিলের শেষে আর একটি দেওয়াল নেমে গেছে। খুব সতর্ক চোখে সে চিহ্ন মিলিয়ে মিলিয়ে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে গেল। এতক্ষণ জলের মধ্যে দম বন্ধ করে থাকতে তার খুব একটা কষ্ট হচ্ছে না, অভ্যাস তাকে সক্রিয় রাখছে। নির্দিষ্ট পাথরটা হাত দিয়ে সজোরে সরিয়ে লোকটি চমকে উঠল। আগের বারের শঙ্কাটি এবার সত্যে পরিণত হয়েছে। এই পাথর সরাতেই ভেতরে যাবার একটি অপ্রশস্ত সুড়ঙ্গ পাওয়া যেত। সুড়ঙ্গটির চারপাশের দেওয়াল ভেঙে পড়ায় সেটি একেবারেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। মুহূর্ত বিলম্ব না করে লোকটি সঙ্গে সঙ্গে ভেসে উঠল।

তার সঙ্গীরা এত দ্রুত প্রত্যাবর্তন আশা করেনি। সবাই সচকিত হয়ে তার দিকে তাকালে সে ঘটনাটি জানাল। সঙ্গে সঙ্গে একজন বলে উঠল, 'আমি হাজারবার বলেছি এইভাবে মাল গচ্ছিত রাখা ঠিক হবে না। না, তোমাদের এক কথা, বাপ পিতামহের আদেশ মানতে হবে। আরে তখন একরকম দিন ছিল আর এখন অন্যরকম। এখন বোঝ ঠ্যালা।'

দলের মধ্যে যে প্রবীণ সে বলল, 'মাথা ঠাণ্ডা রাখো, মাথা

ঠাণ্ডা রাখো। ও রাস্তা দিয়ে আর ঢোকা যাবে না?'

যে জলে নেমেছিল সে ভেজা পুঁটলিটা নৌকায় রেখে বলল, 'না। খোলা জায়গা হলে ইঁট সরাতে পারতাম, ডুবে গিয়ে কে সরাবে?'

আর একজন বলল, 'গতবারই যখন কথাটা উঠেছিল তখনই মাল বের করে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ইঁটগুলো পড়ল কি করে?'

কয়েকপুরুষ আগে তান্ত্রিক বগলাচরণের আদেশে কালীকিঙ্কর রায় গঙ্গার পাশে মাটির নীচে যে কক্ষটি নির্মাণ করিয়েছিলেন সেটি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়েছিল। কোন্নগরের বিখ্যাত রাজমিস্ত্রি শম্ভুচরণের হাতের কাজ সমালোচনার ঊর্ধ্বে কালীকিঙ্কর নিশ্চিন্ত ছিলেন। কক্ষটি তৈরী করার সময় শম্ভুচরণের মাথায় একটি সুবুদ্ধির উদয় হল। বংশ পরম্পরায় তার আর একটি উপার্জনের রাস্তা আছে। প্রতি অমাবস্যায় আট দশ গাঁ ছেড়ে দিয়ে গঙ্গায় ডাকাতি করা একটি পবিত্র কর্মের মত যা থেকে আয় কম হয় না। কিন্তু এখন মানুষ সজাগ হয়ে পড়েছে, পুলিসের কাছে খবর দেবার জন্যই সবাই মুখিয়ে আছে। আহরিত ধন রাখা একটা সমস্যা। কালীকিঙ্কর রায় কেন ওই কক্ষ নির্মাণ করাচ্ছেন তা সে জানত। এই কক্ষে প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মী চিরকাল বন্দী হয়ে থাকবেন, কখনো ওই ঘরের দরজা রায়রা নিজেদের কল্যাণে খুলবে

না। এরকম একটি নিশ্চিন্ত জায়গার সুযোগ নিতে ছাড়ল না শম্ভুচরণ। গোপনে ওই কক্ষটিতে সে এমন একটা সুড়ঙ্গ তৈরী করে রাখল যেখানে গঙ্গায় ডুব দিয়ে আসা যায়। যতদিন সে জীবিত ও কর্মক্ষম ছিল ততদিন ডাকাতির সম্পদ সে ওই সুড়ঙ্গপথে রেখে গেছে। মারা যাওয়ার সময় এ খবর বংশধরদের দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে সে, ও ঘরে লক্ষ্মী বাঁধা আছেন, তিনিই এই ধন পাহারা দেবেন। শম্ভুচরণের বংশধররা একই পথ অনুসরণ করল। অমাবস্যায় এখানে আসতে কোন অসুবিধে নেই। লুঠের ধন তারা যেমন রেখে যেত প্রয়োজনে এখান থেকে নিয়ে নিত। একটি নিশ্চিন্ত জায়গা। কেউ কেউ নিরাপত্তার কথা তুলেছে কিন্তু মানুষ ধর্মের আদেশ যেহেতু কখনও নস্যাৎ করতে পারে না তাই নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হওয়ার কোন সম্ভাবনাই ছিল না।

পূর্ণিমার রাতে ডাকাতি সাধারণত এই বংশধররা করে না। কিন্তু আজ এমন একটি শিকার পাওয়া গিয়েছিল না করে উপায় ছিল না। সেই ধন রাখতে গিয়েই আবিষ্কার হ'ল গুহার মুখ বন্ধ। দলনায়ক বলল, 'দেখে মনে হল ইঁটগুলো আপনা আপনি পড়েছে, কেউ ফেলেনি।'

ওরা দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল। না, কোন অবস্থায় ওই সম্পত্তি এই বাড়িতে আর রাখা যাবে না। আজ রাত্রেই সব তুলে নিয়ে

যাওয়া যাক। ভোরের আগেই এখান থেকে সরে পড়তে হবে। এত পুরুষের সঞ্চয় রায়বাড়ির লক্ষ্মীঠাকুরের জিম্মায় ফেলে রেখে চিরকালের জন্য চলে যাওয়া যায় না। ওরা মতলব ঠিক করে নিয়ে যে-পথ দিয়ে মেজকর্তা শিবশঙ্কর যাওয়া আসা করেন সে পথে উঠে এল। প্রত্যেকেই সশস্ত্র, মুখ কাপড়ে ঢাকা। প্রয়োজনে হত্যা অতি সাধারণ ঘটনা।

রায়বাড়ি এখন ঘুমন্ত। শুধু দোতলার ঘরে কথক-ঠাকুর এক স্বরে পড়ে যাচ্ছেন, 'কোজাগরী পূর্ণিমায় পূজন যে করে। দেহ পরিহরি যায় বৈকুণ্ঠ নগরে॥' তাঁর গলা এখন স্তিমিত। দাস-দাসীরা যারা জেগে আছে তারা সেখানে গিয়ে জুটেছে। শম্ভুচরণের বংশধরদের কোন অসুবিধে হল না। ছায়ার মত তারা বাড়িময় ছড়িয়ে পড়ল। দুজন চাতালে, দুজন বাইরের দিকে থাকল পাহারায়। বাকী দুজন সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে পড়ল। এ বাড়ির প্রতিটি ধাপ নকশা তাদের মাথায় গাঁথা আছে।

নীচের চাতালে নেমে দলনায়ক ও প্রবীণ দেখল অজস্র পূজার উপচার ছড়ানো। এক স্বাস্থ্যবান যুবক চেয়ারে বসে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। সেখানে অপরূপা এক বালিকা আসনে বসে মাথা ঝুঁকিয়ে ঝিমুনির মধ্যে রয়েছে। দলনায়কের হাতের তলোয়ার যুবকের দিকে উদ্যত হতেই প্রবীণ তাকে বাধা দিল,

'দরকার নেই। ও নুলো, বোবা। এ বাড়ির ছোটকর্তা আর ও বোধহয় ছোট বউ।'

দলনায়ক বলল, 'বউটা তাহলে বিগড়াবে।'

প্রবীণ বলল, 'আমি ওকে সামলাচ্ছি, তুই দরজা ভাঙ।'

পায়ের শব্দে লক্ষ্মীর তন্দ্রা কেটে গেল। সে সচেতন হয়ে সোজা হয়ে বসতে গিয়ে আঁতকে উঠল। এক যমের মত চেহারার মানুষ তার দিকে সড়কি তুলে দাঁড়িয়ে আছে। চোখাচোখি হতে বলল, 'একটা শব্দ হলেই প্রাণ খতম করে দেব।'

লক্ষ্মীর হাত-পা কাঁপতে লাগল, গলা শুকিয়ে কাঠ। মনে হল সে আর বাঁচবে না। তার জ্ঞান লোপ পেতে লাগল।

বিশাল তালা খুলতে একটু বেগ পেল দলনায়ক। মেটাল মাটিতে ফেলে সে যখন দরজায় হাত দিয়ে সামান্য ঠেলেছে তখনই তীক্ষ্ণ শিস ভেসে এল। ডাকাতি করতে গিয়ে অত্যন্ত বিপদের সময় সবাইকে সতর্ক করে দেওয়ার সময় এই শিস দেওয়া হয়। দলনায়ক চকিতে ঘুরে দাঁড়াতে প্রবীণ সচকিত হল। এক মুহূর্ত পরেই আবার শিস শোনা গেল। কথা বলার সময় নষ্ট না করে ওরা দ্রুতপদে ওপরে উঠে এল। চার পাহারাদার তখন একত্রে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের দেখে একজন বলে উঠল, 'পুলিস। সারা বাড়ি ঘিরে ফেলেছে। কি করে খবর পেল?'

দলনায়ক বিস্মিত হয়ে বলল, 'পুলিস? সেকি! নদীর

দিকে এসেছে ?'

প্রবীণ বলল, 'কপালে যা আছে তাই হবে। কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। চল পালাই।'

কয়েক মুহূর্ত পরেই তিনটে ছিপ তীরের গতিতে মাঝগঙ্গায় চলে গেল।

পুলিস এসেছে খবরটা দোতলায় পৌঁছালে তারাসুন্দরী চমকে উঠলেন। সদ্য ঘুম ভাঙা সরকার মশাই বিব্রত মুখে দোতলায় দাঁড়িয়ে। থানার দারোগা তাকে ঘুম থেকে তুলে পাঠিয়েছেন অন্দরমহলে। তারাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করলেন, 'পুলিস কেন ?'

'ওরা সমস্ত বাড়ি খুঁজে দেখতে চায়।' সরকার মশাই-এর চোখ মাটিতে।

'খুঁজে দেখতে চায়, কেন ?' তারাসুন্দরীর মাথায় কিছু ঢুকছিল না।

'মেজকর্তাকে।'

সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন তারাসুন্দরী। খুব অহঙ্কারী এবং তেজী দেখাচ্ছিল তাঁকে। পাঁচালির শ্রোতারা অবাক চোখে দেখল তারাসুন্দরী দৃঢ় পায়ে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। বাইরের ঘরে এসে থমকে দাঁড়ালেন তারাসুন্দরী। হ্যারিকেনের আলোয় চারপাশ থমথমে। আজ অবধি এ বাড়ির কোন বউ অপরিচিত পুরুষকে মুখ দেখায়নি। কিন্তু এই

কোজাগরীর রাতে তাঁর মাথায় আগুন জ্বলছিল। বড়কর্তা নেই, মেজকর্তা উধাও, সব দায়িত্ব এখন তাঁর কাঁধে।

থানার দারোগা এতটা আশা করেননি। নমস্কার করে তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন।

দৃঢ় কণ্ঠে তারাসুন্দরী প্রতিবাদ করলেন, 'না, তা হতে দেব না।'

দারোগার গলার স্বর বিনীত, 'কিন্তু মা, এ ছাড়া উপায় নেই। সরকার বাহাদুরের আদেশ! আপনি বাধা দেবেন না। মেজকর্তা ইংরেজদের তাড়ানোর জন্য বিপ্লব করার চেষ্টা করছেন। খবরটা আমি জানতাম কিন্তু এখন খোদ পুলিসসুপার ওয়ারেণ্ট সই করে পাঠিয়েছেন।'

তারাসুন্দরী বললেন, 'সে এখন এ বাড়িতে নেই।'

দারোগা বললেন, 'জানি। তবু খুঁজতে হবে, কারণ অন্য প্রমাণ থাকতে পারে।'

তারাসুন্দরী মাথা তুললেন, 'আপনি জানেন আমরা রায়বাহাদুরের বংশধর। এর ফল কি জানেন?'

দারোগা বললেন, 'জানি। কিন্তু এখন পরিস্থিতি অন্যরকম। বাধা দিলে আমাকে জোর করতে হবে।'

তারাসুন্দরী চমকে উঠলেন। ওরা জোর করে বাড়িতে ঢুকবে? জীবনে এই প্রথম রামকিঙ্করের ওপর তিনি ভীষণ

ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। আজকের রাতটাও তিনি বাড়িতে থাকতে পারলেন না! কিন্তু কি করে এদের ঠেকানো যায়। আজ দেবীর প্রতিষ্ঠার রাত। এই রাতে ওদের ঢুকতে দিলে তো দেবীরই অসম্মান হবে। তা হতে দেওয়া যায় না। তার গলায় মিনতি ফুটে উঠল, 'আজকের রাতটা কোনরকমে অপেক্ষা করা যায় না?'

দারোগার চোখে প্রথমে বিস্ময়ের ছায়া পড়ল কিন্তু তারপরই তিনি মাথা নাড়লেন, যেন কারণটা ধরতে পেরেছেন। তাই দেখে তারাসুন্দরী আশান্বিত হলেন, 'আমাদের বাড়িতে লক্ষ্মীর চিরকালের আসন বাঁধা, আজ একটি বিশিষ্ট রাত। এই রাতটা যদি—।'

দারোগা ঘাড় সোজা করলেন। এ বাড়ির জাগ্রত দেবীর কথা তিনি জানেন। একটু ভেবে নিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, আমি ভোর হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করছি। এর মধ্যে কেউ যেন বাইরে যাওয়ার চেষ্টা না করে। সবাইকে নীচের এই ঘরে উপস্থিত থাকতে বলুন। আপনাদের এই বাড়ি আমরা ঘিরে ফেলেছি!'

তারাসুন্দরীর বুক থেকে একটা পাহাড়চাপ ধীরে ধীরে সরে গেল! তিনি জানেন শুধু ভোর হওয়ার অপেক্ষা—তারপর যা করার দেবীই করবেন। এমন সময় নিস্তব্ধ রাজপথে শব্দ উঠল।

সবাই ঘাড় ফিরিয়ে দেখল বড়কর্তার জুড়ি গাড়ি ধীরে ধীরে এসে প্রধান ফটকের সামনে এসে থামল।

কোচোয়ান তড়িৎগতিতে নেমে দরজা খুলে যাঁকে নামাল তাঁকে দেখে আঁতকে উঠল সবাই। রামকিঙ্কর টলছেন। কিন্তু তাঁর বেশবাস রক্তাক্ত। এখনও কপাল থেকে রক্ত নামছে মুখে। কোচোয়ান তাঁকে ধরেছিল এবার তিনি হুঙ্কার দিয়ে তাকে সরিয়ে দিলেন। তারপর স্খলিত পায়ে এদিকে এলেন চাতাল পেরিয়ে।

ওঁকে দেখে তারাসুন্দরীর গলা থেকে আর্তনাদ বেরিয়ে এসেছিল। অনেক কষ্টে স্বামীর কাছে ছুটে যাওয়া থেকে নিজেকে বিরত রেখেছিলেন তিনি। দারোগা রক্তাক্ত রামকিঙ্করকে দেখতে পেয়ে দ্রুত এগিয়ে গেলেন, 'কি হয়েছে আপনার?'

হাত তুলে অবজ্ঞার ভঙ্গীতে একটা ঢেউ এঁকে রামকিঙ্কর তাঁর পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন, 'পুলিস না? পুলিসই তো? এ বাড়িতে পুলিস কেন?' তাঁর গলার স্বর জড়িত পা টলছে। দারোগা তাঁর স্বভাবে ফিরে গেলেন, 'ওয়ারেন্ট আছে, বাড়ি সার্চ করতে হবে।'

বড় বড় চোখ তুলে রামকিঙ্কর উচ্চারণ করলেন, 'বাড়ি সার্চ করতে হবে? অপরাধ?'

'মেজকর্তা শিবশঙ্করবাবু বিপ্লবী হয়েছেন। ইংরেজ মারতে চান।' দারোগা বলল।

একবার চোখ বন্ধ করে মুখ আকাশের দিকে তুলে পরক্ষণেই সামনে তাকালেন রামকিঙ্কর, 'তা এখানে সঙের মত দাঁড়িয়ে আছেন কেন? যান, খুঁজে দেখুন। বাঁদরটাকে পেলে কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যান এখান থেকে।'

'না।' তারাসুন্দরীর দৃঢ়কণ্ঠ ভেসে এল, 'আমি ওঁকে কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেছি।'

ভ্রূ কুঁচকে গেল রামকিঙ্করের। চোখ স্পষ্ট করে স্ত্রীর অবস্থা লক্ষ্য করে বললেন, 'কেন, কাল সকাল কেন?'

এবার তারাসুন্দরী ভেঙে পড়লেন, 'তুমি জাননা কেন? আজ আমাদের ঘরে দেবীর অধিষ্ঠান। আজকের রাতটা কেটে গেলে কোন অশুভই আর আমাদের কাছে আসবে না।'

হঠাৎ উচ্চকণ্ঠের হাসি সমস্ত বাড়ি কাঁপিয়ে তুলল। পাগলের মত মাথা নেড়ে হাসছেন রামকিঙ্কর। তারপর একসময় চিৎকার করে উঠলেন, 'দেবীর অধিষ্ঠান? তাই না? এইসব বুজরুকিতে আমি আর বিশ্বাস করি না। দ্যাখো দ্যাখো, তোমার দেবী আমার কি করেছেন! আজ সকালে পাওনাদার এসে আমাকে অপমান করার সাহস পেল। সমস্ত শহরে এখন আঙুল তুলে সবাই দেখাচ্ছে লোকটা দেউলিয়া। আস্তাবলের ঘরে সেদিনের একটা ছোকরা আমার গায়ে গুণ্ডা দিয়ে হাত তোলে, হ্যাঁ হ্যাঁ আজকের রাতে। আর চোখের সামনে দেখছ পুলিস

বাড়িতে দাঁড়িয়ে। দেবীর মঙ্গল করার কি নমুনা, আহা! দারোগাবাবু, আপনি সার্চ করুন আমি হাততালি দেব।'

তারাসুন্দরীর কান্না শোনা গেল, 'তুমি বিশ্বাস করো না দেবী এখানে বাঁধা আছেন?'

'না আর করি না। থাকলে এরকম অপমান সহ্য করতে হতো না।' রামকিঙ্কর তখনও টলছিলেন।

'দোহাই, আজকের রাতটা অপেক্ষা কর, তোমার পায়ে পড়ি।' ভেঙ্গে পড়লেন তারাসুন্দরী।

'আজকের রাত! রাত ফুরোতে কত বাকী? ওই তো, শুকতারা দেখা যাচ্ছে না, আমি বিশ্বাস করি না। ঠিক আছে, ওই মেয়েছেলেটাকে আমি একবার প্রশ্ন করব। তোমরা সরে যাও সামনে থেকে, আমি একবার ওর ঘরের সামনে যাব।' দুহাত দিয়ে বাতাস কাটতে কাটতে রামকিঙ্কর এগোতে লাগলেন।

চেতনা স্বচ্ছ হতেই লক্ষ্মীর বুক ধক্‌ধক্ করে উঠল। কারা এসেছিল অমন ডাকাতের মত? এখন সামনে কেউ নেই। দূরে চেয়ারে হরকিঙ্কর চুপচাপ বসে। চোখাচোখি হতে হাসল।

কিন্তু লক্ষ্মীর হাসি আসছে না। ওর মনে হল গলা ফাটিয়ে একবার চিৎকার করে সবাইকে ডাকে। যারা এসেছিল তারা নিশ্চয়ই ডাকাত। কিন্তু পালাল কেন ওরা। এইসব ভাবতে ভাবতে সে উঠে দাঁড়াতেই পাথর হয়ে গেল। দেবীর ঘরের দরজার তালা ভেঙ্গে ঝুলছে। দরজার একটা পাল্লা সামান্য খোলা। সমস্ত শরীর হিম হয়ে গেল তার। ওই ঘরে কত বছর ধরে লক্ষ্মীদেবী বন্দী হয়ে আছেন, দরজা খোলা নিষেধ। কিন্তু এখন কি হবে? লোকগুলো দরজা খুলেছিল কেন? কি করবে বুঝতে না পেরে সে দু পা এগিয়ে গেল। আর তখনই সেই কৌতূহলটা হুড়মুড় করে মাথায় ঢুকে পড়ল তার। ওই ঘরে দেবী আছেন, তাকে কেমন দেখতে সে অনেক অনুমান করেছে কিন্তু দরজা না খোলা হলে দেখা যাবে না। এখন সেই সুযোগ সামনে। সে তো কোন অন্যায় করছে না। একবার এক মুহূর্তের জন্য দেবীকে দেখে বেরিয়ে এসে দরজা বন্ধ করে সবাইকে ডাকবে। আগে ডাকলে আর দেখা যাবে না, বড় বউ এসে দরজা বন্ধ করে দেবেন আগেই।

চোরের মত পা ফেলে অসীম কৌতূহলে লক্ষ্মী দরজায় হাত রাখল। ভেতরটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। সে এক পা এক পা করে ভেতরে ঢুকল। একটু এগোতেই ধক্ করে একটা গন্ধ লাগল নাকে। দম বন্ধ হয়ে আসছে। এত অন্ধকার, চোখ যায় না

সামান্য। বাঁ দিকে সামান্য এগোতেই হোঁচট খেল সে। পায়ে পায়ে জড়িয়ে গিয়ে আছাড় খেয়ে যখন সে পড়ছে তখন তার সর্বাঙ্গ থর থর করে কাঁপছিল। কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল, আতঙ্কে চেতনা হারাল সে।

রামকিঙ্করকে ঠেকাবে এ বাড়িতে তেমন সাহস কারো নেই। মাটির নীচে যাওয়ার সিঁড়িতে এসে দুবার পড়তে পড়তে বেঁচে গেলেন তিনি। তাঁর মুখ এখন বীভৎস দেখাচ্ছে। অদ্ভুত জেদ এবং নেশার ঘোরে শেষ পর্যন্ত নীচে নেমে এলেন রামকিঙ্কর। নামতেই প্রথমে চোখে পড়ল চাতালের মাঝখানে লেংচে লেংচে যাচ্ছে ছোটকর্তা হরকিঙ্কর।

‘এ এখানে কেন?’ রামকিঙ্কর গর্জে উঠলেন, ‘পূজা হল অথচ এখানে কেউ নেই? সবাই তামাসা দেখতে গেছে? এখানে রাত জাগছে কে?’

কারো উদ্দেশে বলা নয় কিন্তু প্রশ্নগুলো পেছন পেছন আসা আত্মীয়স্বজন এবং দাসদাসীর কানে পৌঁছাল। তারাসুন্দরী এগিয়ে আসছিলেন এমন সময় রামকিঙ্কর তীব্র আর্তনাদ করে

উঠলেন। 'একি। ঘরের দরজা খুলল কে?'

কয়েক মুহূর্ত যেন পৃথিবী নিশ্চল হয়ে গেল। রামকিঙ্কর চোখের সামনে পৃথিবীটাকে দুলতে দেখলেন। দুহাতে শূন্যে কিছু আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করলেন তিনি। ব্যাপারটা পেছনের দর্শকদের চোখে পড়ায় একটা অস্ফুট শব্দ উঠল।

গুঞ্জনটা শুরু হওয়া মাত্র তারাসুন্দরী পাগলের মত সামনে ছুটে এলেন। কিন্তু ততক্ষণে রামকিঙ্কর সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। নেশা এখন অনেক তরল, হাত বাড়িয়ে স্ত্রীকে বাধা দিলেন তিনি। তারাসুন্দরী এখন উন্মাদিনীর মত চিৎকার করছেন, 'কে খুলল মায়ের দরজা?'

হা হা করে হেসে উঠলেন রামকিঙ্কর, 'পালিয়েছে সে পালিয়েছে। কিন্তু পালাবে কি করে, থাকলে তো পালাবে! কালীকিঙ্করের আত্মা নাকি তাকে ধরে রেখেছিল। আমি দেখব সে আছে কি না—নিজের চোখে দেখব! তাঁর কথাগুলো এখন অসংলগ্ন, বীভৎস মুখে ক্রূরতা ফুটে উঠেছে। চকিতে জলচৌকির ওপর রাখা পিতলের জ্বলন্ত প্রদীপ তুলে ধরে এগোলেন রামকিঙ্কর। দরজার সামনে যেতে প্রবল পদাঘাত করে হাট করে দরজা খুলে ফেললেন তিনি। শব্দ করে তালাটা কোথায় ছিটকে পড়ল। রামকিঙ্কর এখন সম্পূর্ণ অপ্রকৃতিস্থ।

নিকষ কালো অন্ধকারে চোখ অন্ধ হয়ে গেল। মাথার

ওপর প্রদীপ ধরে চিৎকার করে উঠলেন রামকিঙ্কর, 'কোথায় লক্ষ্মী! কোথায় তুমি, লক্ষ্মী?' বদ্ধ ঘরে তাঁর গলা গমগম করছে। শব্দটা পাক খেয়ে বাইরের লোকের কানে একটা ভয়ঙ্কর আর্তনাদের মত বাজছিল।

শূন্য ঘরের দেওয়ালে আলো পড়ে একটা ভৌতিক ছায়া কাঁপছে। পাগলের মত মুখ ওপরে তুলে রামকিঙ্কর প্রদীপ ওপরে তুলে ধরে হাঁটছিলেন আর চিৎকার করছিলেন। হঠাৎ তাঁর পায়ের আঘাতে একটা ঘট আর শুকনো ডাব ছিটকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে পাগল হয়ে গেলেন তিনি, 'সব ভাঁওতা, নেই—নেই।' শব্দটা কান্নায় জড়িয়ে যাচ্ছিল।

হঠাৎ রামকিঙ্করের কানে একটা গোঙানি বাজল। এই ঘরে কে গোঙায়? বিস্মিত রামকিঙ্কর সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল। প্রদীপ নীচে নামিয়ে ঘরের মেঝেতে নজর বোলাতে গিয়ে তিনি চমকে উঠলেন। প্রথমে মনে হল তাঁর চোখ ঝলসে যাচ্ছে। ঘরে এক কোণায় তাল করে রাখা সোনার গহনা রুপোর টাকায় আলো পড়ে ঝক ঝক করছে। ভাল করে তাকানো যায় না। গোঙানিটা আসছে ওখান থেকেই। মন্ত্রমুগ্ধের মত রামকিঙ্কর সেদিকে পা বাড়াতেই তাঁর শরীরে শিহরণ উঠল।

অপরূপা সুন্দরী একটি বালিকা পড়ে আছে সেই সোনা-

রুপোর পাহাড়ে। তার মাথা কোলের ওপর তুলে যে বসে আছে তাকে দেখে বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন তিনি। একটু আগে যাকে বাইরে দেখেছেন সেই হরকিঙ্কর মাটিতে লেংচে কখন এই ঘরে এসে ঢুকছে। অন্ধকারেই সে তার স্ত্রীর অজ্ঞান শরীর আবিষ্কার করে মাথাটি দুহাতে নিয়ে পরম আদরে ডাকার চেষ্টা করছে। রামকিঙ্করের কানে স্পষ্ট বাজল, 'ও ল-ল-খ্-ই-ঈ।'

মূর্ছা যাওয়া স্ত্রীর জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টায় এতদিন পরে হরকিঙ্করের বাকস্ফুরণ হচ্ছে। প্রদীপের আলো এসে সেই অপরূপ মুখে পড়েছিল। রামকিঙ্কর দেখলেন সেই মুখ এখন ঈশ্বরীর মত নিষ্পাপ। চোখের পাতা এবার থর থর করে কাঁপছে।

গভীর সুখে রামকিঙ্কর গাঢ় গলায় বলে উঠলেন, 'ছ্যাখো ছ্যাখো সবাই, লক্ষ্মী চোখ খুলছেন, এ বাড়িতে লক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা হচ্ছে তোমরা ছ্যাখো।'

হরকিঙ্কর তখনো প্রাণপণে স্ত্রীকে ডেকে চলেছেন, স্ত্রীর শেখানো নাম ধরে।

—শেষ—